পান্নাদ্বীপ

শেফালি নন্দী

নয়া প্রকাশনী
কলিকাতা-২৯

ভূমিকা

স্বাধীনতা লাভের পরেই জাতির নিজস্ব জীবন আরম্ভ হয়। তখন তার প্রয়োজন হয় নিজের চোখ দিয়ে অপরকে দেখা ও নিজের মন দিয়ে অপরকে চেনা। এই দেখা অবশ্য দূতাবাসের মারফতেও হয়, কিন্তু তাতে চেনা হয় না। সাধারণ মানুষকে পরিচয় করতে হয় সাধারণ মানুষের সঙ্গে। মনে হয়, সে সুযোগ হয়ত আমরাও গ্রহণ করছি। শ্রীমতী শেফালি নন্দী বিলাতে শিক্ষাবিদ্যায় বিদ্যালাভ করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু ইউরোপের নানা দেশের মানুষের সঙ্গে চেনা-পরিচয় না করে তিনি স্বস্তি পান নি, সম্ভবত এই জন্যই আয়র্ল্যাণ্ডে তিনি পড়তে যান নি, গিয়েছিলেন পরিচয়ের টানে। 'পান্নাদ্বীপ' তারই স্মৃতি।

'পান্নাদ্বীপের' এই স্বচ্ছন্দ কথাটি ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য লেখা। বড়দের জন্য কোনো দেশ-পরিচয় লেখাও সহজ নয়। কিন্তু ছোটদের জন্য তা লেখা আরও কঠিন। অথচ তার প্রয়োজন কম নয়। তথ্যের বস্তুলোকের সঙ্গে রূপকথার কল্পলোক ছেলেদের মনে সহজভাবেই মিশে থাকে। তারই মধ্য দিয়ে আবার মানুষের পরিচয় জীইয়ে তুলতে হয়। 'পান্নাদ্বীপের' এই নাতিদীর্ঘ কাহিনীতে লেখিকা এ কাজে সার্থক হয়েছেন, হয়ত শিশু মনের সঙ্গে তাঁর স্বাভাবিক আত্মীয়তার গুণে। তাতে 'পান্নাদ্বীপের' প্রকৃতি ও মানুষকে তিনি ছেলেমেয়েদের কাছে জীবন্ত করে তুলতে পেরেছেন। সকল দেশ ও তার মানুষের সঙ্গে আমাদের শিশু ও কিশোরদের পরিচয় এইভাবে ঘনিষ্ঠ হোক।

গোপাল হালদার

পল্টু আর
পিণ্টু কে—
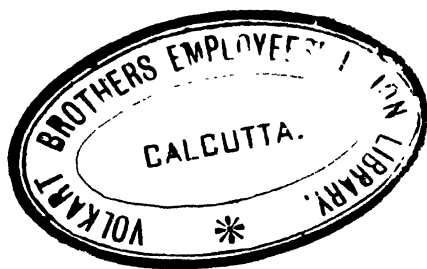
পান্নাদ্বীপ

এশিয়া আর ইউরোপের মানচিত্র খুলে বসলে একেবারে বাঁহাতের দিকে যে ঘননীল মহাসাগরটা পড়ে তার নাম অতলান্তিক—অন্ত তার খুঁজতে হলে যেতে হবে অতলে তলিয়ে। তারই বুকে ফ্রান্সের গা ঘেঁসে লম্বাটে বেয়াড়া ধরণের একটা দ্বীপ দাঁড়িয়ে সারা পৃথিবীর দিকে নজর রাখছে, আর প্রায় গোটা পৃথিবীর লোকও এককালে এদের দিকে ভয়, বিস্ময় আর ঘৃণা নিয়ে তাকিয়ে থাকত, কখন কার বাড়ীতে সূঁচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরোবে, কে জানে? কিন্তু তারই বাঁহাতে আর একটি ঠাণ্ডা মেজাজের ছোট্ট দ্বীপ সবুজ জামা গায়ে, দূর থেকে দেখলে মনে হবে যেন মায়ের সংগে বেড়াতে বেরিয়েছে। কমবয়সী মায়ের বড় মেয়ে, মায়ের গায়ে লাল জামা আর যেন তার সংগে মিল রাখার জন্য মেয়ের সবুজ জামার সংগে মাথায় একটু লাল ফিতে বাঁধা। ভাল করে খোঁজ নিলে কিন্তু দেখা যাবে, মেয়েটি রাজকুমারী আর পাশে ঝকঝকে লাল জামা পরা মা তার রাক্ষসী সৎমা, মেয়েটি বড়

হবার পর তাকে হাতে পেয়েছিল, তারপর থেকে ক্রমাগত তার চিন্তা, কি করে তাকে নির্বাসন দিয়ে তার রাজ্যপাট দখল করবে। নিতান্ত নিরুপায় হয়ে যখন কোনমতেই পান্নাকুমারীর সংগে পেরে উঠল না, তাকে ইচ্ছামত চলতে দিতেই হল, তবুও তার মাথায় বেঁধে দিল লাল ফিতে, যেন কোনদিন সে ভুলতে না পারে তার নতুন মায়ের কথা।

এই যে ছোট্ট সবুজে মোড়া দ্বীপটি তার আসল নাম হল 'এমারেল্ড আইল',—অর্থাৎ পান্নাদ্বীপ। আমরা কিন্তু তাকে জানি আয়ার্ল্যাণ্ড বলে। আর সে আয়াল্যাণ্ড নামটা আমাদের কাছে এসেছে ইংরেজদের মারফৎ, তাই আমরাও তাকে অমন বিশ্রী করে বানান করতে শিখেছি, IRELAND, আসলে বানানটা হল EIRE. ইংরেজেরা বানানটা করেছিল ওদের ইচ্ছামত, তাই ওরা পান্নাদ্বীপ থেকে বিদায় হবার সংগে সংগেই সে দেশবাসীরা তাদের প্রিয় EIRE নামটা নিয়ে শাসকের দেওয়া নামটাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে। আইরিশ EIRE (এয়ার) কথাটারই মানে হল পান্নাদ্বীপ, ইংরেজীতে Emerald Isle.

পান্নাদ্বীপ নামটা বড় আদরের, শুনলেই মনে হয় হাসিতে তার পান্না ঝরে, তার সে হাসির সংগে সাদৃশ্য রাখার জন্যই সেদেশে বাস, ট্রেণ, পোষ্টবক্স অর্থাৎ সরকারী সব জিনিষপত্র সবুজ রংএ মোড়া। আমরা বৃটিশ রাজত্বের লোক ছিলাম অনেকদিন, আমাদের রঙ্ লাল। এখনও আমরা লাল রঙই ব্যবহার করি। তাই সেবার পান্নাদ্বীপ দেখতে গিয়ে কি

বিপদেই যে পড়েছিলাম ! সবুজ বাক্সটার মধ্যে যে চিঠি ফেলতে হবে বুঝতে পারি নি; পোষ্ট অফিস খুঁজে বার করতে গিয়ে যে সবুজ রঙের বাড়ী খুঁজতে হবে তাও জানি না, বাসে উঠব, তা সব বাসগুলোই যে মেয়ে ইস্কুলের বাসের মত সবুজ রঙ্‌এর, আমাদের মত লালরঙের লোকদের দেখে ওরা হেসে গড়াগড়ি দেয়, বলে "তোমাকে কিছুদিন সবুজ রঙ্‌এর জেলখানায় রেখে দিলেই ঠিক হবে।"

ভয় পেয়ে বলি "ওরে বাবা, আমি এবার থেকে আর ভুল করব না।" আর মনে মনে বলি "মানে মানে পালাতে পারলে বাঁচি, একি উদ্ভট দেশ রে বাবা !"

আসলে কিন্তু আমার মনে হয় ইংরেজকে তাড়িয়েছে, পান্নাদ্বীপের রঙ্‌ নয়—তার ভাষা। বোধ হয় এই আইরিশ ভাষার পাঠোদ্ধার করতে না পেরেই ইংরেজ তল্পী-তল্পা গুটিয়ে তাড়াতাড়ি ওদেশ ছেড়ে পালিয়েছে। ওদের ছেলেমেয়েরা বলে "ইংরেজ আমাদের দেশ শাসন করতে এসেছিল, আমরা তাদের লাথি মেরে তাড়িয়েছি।" কথাটা হয়ত শুনতে খুব ভাল লাগে না, কারণ লাথি মারা কথাটা খুব অভদ্রতার পরিচায়ক, কিন্তু ওদের স্বাধীনচিত্ততার কথা ভাবলে খুব ভাল লাগে নাকি ? যে শত্রু, যে আমার দেশ থেকে সব ভাল শুষে নিয়ে গিয়ে নিজের দেশকে সমৃদ্ধিশালী করে আর বলে 'আমরা তোমাদের মানুষ করছি, তোমাদের দেশের ভাল করছি'—তাদের হঠিয়ে দিয়ে ওকথা বলাটা খুব অস্বাভাবিক হয় কি ?

যা বলছিলাম, আইরিশ ভাষার কথা—আমার এক বন্ধু, নাম তার "ময়রা," মিষ্টি যে বানায়, সে ময়রা নয় কিন্তু, এটা 'ম'য়ের উপর জোর দিয়ে পড়তে হয়। ওরা আমাকে বুঝিয়ে দিল, ইংরেজী 'মেরী' নামটা ওদের দেশীয় উচ্চারণে ময়রা হয়ে গিয়েছে—যেমন আমাদের 'শ্রীকৃষ্ণ' দেশীয় উচ্চারণে 'ছিরিকেষ্ট' হয়ে যায়। ওর ভাইয়ের নাম হল 'শোন্'—শোনা গেল ওটা ইংরেজী 'জন'এর আইরিশ সংস্করণ। প্রধানমন্ত্রীকে ওরা বলে টিশক্—তখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ডি-ভ্যালেরা। ভদ্রলোক সেই যে আইরিশ স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের সময়কার নেতৃত্ব করেছিলেন, সে নেতৃত্ব আর তাঁর কাঁধ থেকে বেশীদিনের জন্য নামে নি, একাদিক্রমে প্রায় পঁচিশ বছর ধরে প্রধানমন্ত্রিত্ব করেছেন। মাঝখানে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কিছু পরে একবার দু'তিন বছরের জন্য বিশ্রাম পেয়েছিলেন, এই কয়েকদিন হল তিনি এবার ভোটে হেরে গিয়েছেন ; এখন তিনি আর প্রধান মন্ত্রী নেই বটে, তবে আবার হয়ত জোয়াল কাঁধে নিতে হবে পরেরবারের নির্বাচনেই। যাক্‌গে, যা বলছিলাম, ডি-ভ্যালেরার কথা আর তার সংগে আইরিশ ভাষার কথা উঠতেই 'শোন্' আমাকে বলল—তুমি যদি 'টি-শপ্' (অর্থাৎ কিনা বাংলায় চায়ের দোকান) মনে রাখ, তাহলেই আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে মনে রাখতে পারবে। আর দেখলাম সত্যিই তাই, আজ পর্যন্তও টি-শক্ কথাটা বেশ মনে আছে।

এই অবধি কিন্তু বেশ ছিল, কিন্তু গোল বাধল রাস্তায় বার হবার কথা হতেই। ময়রা বলল—"আজ ছুটির দিন কি আর

দেখবে—চল তোমাকে কিলআরনি পাহাড়ের উপর নিয়ে যাই”—শুনেই ত চমকে উঠলাম—এ বলে কিরে বাপু—শেষ কালে কি পাহাড়ের উপর নিয়ে গিয়ে মারধোর করবে নাকি ? তবু বললাম ‘চল যাই’। সাগর-বেলায় ছোট্ট দুটো গ্রাম ডানলেয়ারী আর গ্লেনগেয়ারী (Danloghare, Glen-loghare) আইরিশ বানানের কল্যাণে ও নাম দুটো প্রথমে ত উচ্চারণ করতে পারিনি। সমুদ্রের পাড় দিয়ে পাহাড় ঘুরে ঘুরে উঠে গেছে বাসের রাস্তা। কাদামাটি বেশী নেই, দ্বীপের পাথুরে রাস্তা কিনা, তাই বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। পাহাড়তলায় বন, তার এখনকার, মানে শীতকালের চেহারা খুব একটা প্রীতিকর নয়। তবে বোঝা গেল বসন্তকাল এলে যখন গাছে গাছে মুকুল ধরার পালা সুরু হয়, তখন চারদিক বড় মনোরম আর লোভনীয় হয়ে ওঠে। বিশেষ করে বাংলাদেশের লোক, যারা সাপ-জোঁক আরও নানারকম জীব-জন্তুর ভয়ে দেশের যে কোন জঙ্গলে প্রবেশ করতে ভয় পায়, তাদের কাছে ইউরোপের বনজঙ্গল বড় চমৎকার মনে হয়। কারণ শীতের দেশে ও জিনিষগুলো প্রায় বাঁচতে পারে না, বাঁচলেও এত নির্জীব থাকে যে, মানুষের কোন অনিষ্ট করতে পারে না। বনের ভিতর, শুকনো ঝরা পাতার উপর দিয়ে যখন যাচ্ছিলাম পায়ের তলায় শুকনো পাতা গুঁড়িয়ে, ক্রমশঃ যে পাহাড়ের উপর দিকে উঠছি বেশ বোঝা যাচ্ছিল। পাশেই একটা প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখা গেল। ‘নোরীন’ আমার সংগী ছিল—তাকে জিজ্ঞেস করলাম “ওটা কি, ওকে অমন

শিকল দিয়ে ঘিরে রেখেছেই বা কেন।”

“ওটা একটা নর্মান, না ডেনিশ কি জানি ছুর্গের ভগ্নাবশেষ। জান আমরাও ইংরেজদের মত ভেবেছি ঐ ছুর্গটা রক্ষা করব, তাই চারপাশে শিকল দিয়ে ওটাকে নিষিদ্ধ এলাকা করে রেখে দিয়েছি। সুযোগ সুবিধে পেলেই ওখানটায় একটা মিউজিয়াম বানিয়ে ফেলব।”

কথাটা অবশ্য নোরীন ইংরেজদের ঠাট্টা করেই বলল, কিন্তু আমার মনে হল ইংরেজদের এই গুণটা বেশ প্রশংসনীয়। যে কোন পুরাণো জিনিষটির প্রতিই ওদের ভারী মমতা ; পুরণো বাড়ীগুলো ভেঙ্গে ফেলতে ওদের ভয়ানক আপত্তি, যে কোন গৃহিণী বাড়ী কেনার সময় গর্ব করে বলেন—‘জান, বাড়ীটা ছ’শো বছরের পুরণো।’ কেউ কেউ বলে ‘বাকিংহাম প্যালেসের’ ভিতরটা নাকি এত পুরণো হয়ে গিয়েছে তাতে আর আধুনিক যুগের কোন রাজারাণী বাস করতে পারেন না। ক্রমশঃ নূতন যুগের সুযোগ সুবিধাগুলো সেখানে আমদানী করা অসম্ভব হয়ে পড়ছে, তাই আরও নূতন বাড়ী করার কথা চলছে। তবুও ঐ বাকিংহাম প্যালেসের ভিতরটা সংস্কার করার কথা কেউ ভাবতে পারে না, তাহলে অতীতকে হাতছাড়া করতে হয়। যে জাতির অতীত নেই, তার আছেই বা কি? আর ইংরেজ জাতি ত খুব বেশীদিনের নয়,—এই ধর হাজারখানেক বছরও হবে না। ১০৬৬ খ্রীষ্টাব্দে নরম্যান বিজয়ের পর থেকেই ওদের যা কিছু ইতিহাস আর জারিজুরি। আমাদের প্রাচীন ইতিহাসের সংগে তার তুলনা ত’ হয়ই না, আয়ার্ল্যাণ্ডেরও

ইতিহাস পাওয়া যায় খ্রীষ্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতাব্দী থেকে। ইতিহাসে কেল্ট বলে যে জাতটার উল্লেখ পাওয়া যায় তারাই বোধ হয় আইরিশদের পূর্বপুরুষ। খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে এদের শিল্পকলা যেরকম উন্নত হয়েছিল, তা দেখলে সত্যিই অবাক্ হতে হয়, আর তাতে বোঝা যায় আরও কয়েকশ' বছর আগে থেকেই এরা তার চর্চা করে আসছে, না হলে এত নৈপুণ্য সম্ভব হত না। এই কেল্ট জাতির ভাষা দেশীয় ভাষার সংমিশ্রণে এসে তৈরী হয়েছে আইরিশ ভাষা। তাকে বলে গ্যালিক, আর এই গ্যালিক ভাষাগোষ্ঠীর বর্ণমালার নাম 'ওঘ্যাম'। অতি প্রাচীনকালে খ্রীষ্টান ধর্ম্মপ্রচারক বা ড্রুইড্ পুরোহিতরা এক দুর্বোধ্য ভাষা নিজেদের মধ্যে ব্যবহার করে গোপন সংকেত বা ক্রিয়াকলাপ অন্যের কাছ থেকে গোপন রাখতেন। সেই অক্ষরগুলোই ক্রমে সর্বসাধারণের কাছে প্রচারিত হয়ে এই 'ওঘ্যাম' বর্ণমালা বলে পরিচিত হয়ে যায়।

যদিও গত কয়েকশ' বছর ধরে ইংরেজ শাসনে থাকার দরুণ আইরিশরা প্রায় তাদের ভাষা ভুলতে বসেছিল,—এখনও সুদূর গ্রামাঞ্চলের বুড়োবুড়িরা কথাবার্তা তাঁদের ভাষাতেই বলেন। আর বর্তমানে আইরিশরা স্বাধীন হবার পর থেকে বাধ্যতামূলকভাবে মাতৃভাষা পড়ানো হচ্ছে। ঠিক যেমন আমাদের বাবা মাদের আমলে স্কুলে অন্যান্য ইংরেজী ভাষা আর বিষয়ের সংগে বাধ্যতামূলকভাবে বাংলা পড়ানো হত। আর বি, এ অথবা এম, এ-তে বিশেষ বাংলা পড়াও আমাদের দেশের মনীষীদের অনেক চেষ্টায়, শেষ পর্যন্ত স্বর্গীয়

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় চলন করেছিলেন ১৯২০।২১ সালে। শুনতে খুব অবাক লাগে নাকি, আমাদের মাতৃভাষা অপরকে বাধ্য করতে হয় আমাদের পড়াতে! অবাক লাগলেও করবার কিছু নেই, কারণ আমরা ছিলাম পরাধীন, তাই লেখাপড়াটাও ছিল বিদেশীদের ইচ্ছামত। আয়ার্ল্যাণ্ডেও তাই। পুরাপুরি ঘটনাটা বলছি পরে; এখন টি-শক্ ডি-ভ্যালেরা বাধ্য করেছেন সবাইকে অন্ততঃ স্কুল ফাইন্যাল পর্যন্ত আইরিশ ভাষা পড়তে হবে। রাস্তাঘাটের নাম, জায়গার নাম প্রভৃতি আইরিশ ভাষায় লেখা থাকে। পড়তে অসুবিধা হবার কারণ ওদের গ্যালিকগোষ্ঠীর ওঘ্যাম বর্ণমালার চেহারাটা! সাধারণতঃ যে অক্ষরে ইংরেজী লেখা হয় তাকে বলে রোম্যান অক্ষর, আর সেগুলি আমাদের কাছে পরিচিত বলে মনে হয় বেশ সোজা। তবে এগুলি যে সাদাসিধা, সে বিষয়ে অন্ততঃ কেউ আপত্তি করবে না। এই গ্যালিক অক্ষরগুলো রোম্যান হরফের পাশে লেখা থাকে বলে আঁকাবাঁকা চেহারা নিয়ে ছবির মত সুন্দর দেখায়। মনে হয় যদি পড়তে পারতাম।

কিন্তু এই আইরিশ ভাষা প্রচলনের যাঁরা বিরুদ্ধবাদী তাঁরা বলেন, "কি হবে এটা শিখে?" আয়ার দেশটা বড়ই ছোট। গোটা 'আয়ারল্যাণ্ডটাই' লম্বায় ৩০২ মাইল আর সব চেয়ে চওড়া যায়গা ২২৫ মাইল, তায় আবার দ্বীপ, এখানে সেখানে সমুদ্র এসে প্রবেশ করেছে দেশে, তাই তার গড়-পড়তা ব্যাস ১১০ মাইল মাত্র। এর থেকেও আবার বাদ যাবে উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ড—কারণ তারা ইংরেজী ভাষাই ব্যবহার

করে। সেখানে কাজকর্ম করে খেটে খাওয়ার সুবিধাও বড় কম, না আছে কলকারখানা, না আছে বিরাট ব্যবসা, যা কিছু কাজকর্ম কিছুটা ডাবলিন সহরে, তাতে ত' আর গোটা দেশের লোকের অন্নসংস্থান হয় না, তাই ছেলেরা মেয়েরা বেশীর ভাগই চাকরী করার মত উপযুক্ত হলেই চলে যায়—ইংল্যাণ্ড, না হয় উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডে। পয়সা উপায় করে বেঁচে থাকতে হ'লে এ ছাড়া উপায় নেই ; গোটা কয়েক বাস ট্রেণ, ষ্টেশনের কাজকর্ম, আর ডাবলিনের গোটাকতক অফিস আদালত, স্কুল, কলেজ, আর গ্রামাঞ্চলের কিছু কুটীরশিল্প—সর্বসাকুল্যে এই বোধহয় কর্মক্ষেত্র। আর যেগুলি আছে সেগুলি সর্বসাধারণের জন্য নয়, তার জন্য বিশেষ রকম পড়াশুনা, বিশেষ রকম গুণ থাকা প্রয়োজন। অমন যে পৃথিবীখ্যাত আইরিশ লিনেন, তারও ত জন্মস্থান বৃটিশ-শাসিত নর্দার্ন আয়ার্ল্যাণ্ড। কাজেই এঁরা বলেন—'আইরিশ ভাষাটা ওদের কোন্ কাজে লাগবে ?' তর্কবিতর্কেরও যেমন শেষ নেই, সমালোচনারও তেমনি অবধি নেই এ নিয়ে। 'নোরীন' হল গ্রামের মেয়ে—তাই তার মতটা হ'ল আইরিশ ভাষার সপক্ষে, তাকে জিজ্ঞাসা করলাম "—এই যে রাস্তা-ঘাটের, দোকান-হাটের নামগুলো দেখছি, Killdare কিলডেয়ার, Killbride কিলব্রাইড, Killkenny কিলকেনী—দেখে ত মনে হচ্ছে ইংরেজদের সংস্পর্শে এসে আর যাই হোক্ খুনোখুনীটা তোমরা খুব শিখেছ, আমি ত' প্রাণ নিয়ে তোমাদের দেশ থেকে পালাতে পারলে বাঁচি।"

নোরীন বেজায় আশ্চর্য হয়ে বলল—"বল কি তুমি, ইংরাজরা ত' আড়ালে বলে আমরা ঠাণ্ডা রক্তের লোক ; প'ড়ে প'ড়ে মার খাই, মাথা তুলে প্রতিবাদ করি না, আর তুমি এমন উল্টো দোষারোপ করছ ?''

"ক্রমাগত যদি পিছন এবং সামনে থেকে সবাই মিলে প্ররোচনা দিতে থাকে—"হত্যা কর, হত্যা কর" "মারো" তাহলে তুমি যদি নাও পার, চাই কি বাঙাল দেশের গরম রক্তের মানুষ আমি, তোমাকেই না কলম দিয়ে খুঁচিয়ে মেরে ফেলি।"

"তবুও কিন্তু বুঝতে পারলাম না কেন তুমিই বা আমার উপর অমন খাপ্পা হয়ে উঠলে ?"

"আরে বোকা মেয়ে ঐ যে রাস্তাটার নাম রেখেছ তোমরা Killbride—কোন বুদ্ধিমতী ক'নে কি এ পথ দিয়ে হাঁটতে চাইবে, তোমরা তাকে মেরে ফেলতে চাইছ জেনেও ? কোন ক'নেকে মেরে তোমরা অমন নাম জুটিয়েছ কে জানে ?"

এবার নোরীন উচ্ছ্বসিত হাসিতে একেবারে ভেঙ্গে পড়ল, "আরে, আরে, না তুমি একেবারেই ইংরেজীনবিশ, সবে স্বাধীনতা পাওয়া ভারতের লোক কিনা, তাই ইংরাজী ছাড়া কিছু ভাবতেই পার না। ওটা তোমার ইংরাজী নয়, ওটা আইরিশ ভাষা, 'কিল্' মানে গীর্জা। এই রাস্তাটা গীর্জা-দুহিতা, কারোকে 'হত্যা করা' ওর মনেও আসবে না, ক'নেকে ত নয়ই। আমরা ধর্মে রোম্যান ক্যাথলিক, "গীর্জা'' আমাদের ধর্মের সংগে, জীবনযাত্রার সংগে এক হয়ে গিয়েছে,

তাই আমরা যে কোন নামের সংগে 'কিল্' কথাটা ব্যবহার করে ধর্মপ্রাণতার পরিচয় দিই। তোমার মত বিদেশীরা মনে করে 'হত্যা কর' আর আমরা ধার্মিক লোক, মনে করি আমাদের পবিত্র গীর্জাকে।"

"উঃ, ভাগ্যিস্ তোমাকে জিজ্ঞাসা করলাম, নাহলে ইংরাজদের মত আমাকেও তল্পীতল্পা গুটিয়ে পৈত্রিক প্রাণটা নিয়ে পালাতে হত, ওদের নাহয় বিলক্ষণ স্বার্থ ছিল, তাই তোমরা স্বাধীনতার যুদ্ধ আরম্ভ না করা পর্যন্ত ওরা বেশ বসেছিল। আমার ত আর তা নেই, বেঘোরে প্রাণটা হারাবার কথা কল্পনা করতেও পারতাম না।"

আমার কৃত্রিম ভয় পাওয়ার ভংগী দেখে নোরীনের প্রাণ-চঞ্চল হাসি পথচারীদের সচকিত করে তুলল।

ইংলিশ আর আইরিশ

নোরীন-এর কতই বা আর বয়স হবে, এই তেরো কি চৌদ্দ, শীতের দেশের মেয়ে বলে ছোটই দেখায়, প্রায় সারাদিনই আমার সংগে থাকত। একদিন ওর দিদি ময়রা আর আমি বেড়াতে বেড়াতে গল্প করছি, নোরীনও ছিল সংগে। ওদের রাস্তার হু'পাশে বাড়ীগুলো ভারী সুন্দর। কোথাও বা সমুদ্রের ধারে বাড়ীগুলো একপাশে, লাল টালি ছাওয়া সাদা বাংলোগুলো—সামনে আবার একটুখানি লনে গোটাকয়েক স্থাড়া গাছ, মাঝখানে ঝকঝকে পীচের রাস্তা। শুনলাম নোরীন অনর্গল বকে যাচ্ছে—"এই যে লনগুলো দেখছ, এখন মনে হচ্ছে ভারী বিশ্রী, শীতে সব পাতা ঝরে গিয়েছে কি না তাই, কিন্তু আর কিছুদিন পর যখন শীত শেষ হয়ে যাবে, মাটির ভিতর থেকে ক্রোকাস্ ফুলগুলো মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে, সামনের বড় গাছগুলো কচি পাতা আর মুকুলে ভরে যাবে, তখন দেখতে কি যে সুন্দর হবে তা আর কি বলব।"

ওকে খেপাবার জন্য বললাম—"খুব যে বড়াই করা হচ্ছে সুন্দর দেশের মেয়ে বলে, আমি যেন আর জানি না, আজ-

কালের মধ্যেই যখন বরফ পড়ে রাস্তায় প্যাচপেচে কাদা হয়ে যাবে তখন?”

“যাও তুমি ভারী নিন্দুক, তোমার সংগে আর কথা বলব না, বরফ পড়লে যে কি সুন্দর দেখায় তা যদি তোমাকে দেখাতে পারতাম, তাহলেই তুমি জব্দ হয়ে যেতে।”

“চাই না আমি তোমাদের এ পচা দেশের বরফে ঢাকা বুড়ো চেহারা দেখতে। একেই ত শীতে হি হি করে কাঁপছি, এর উপর বরফ পড়লেই ত গিয়েছি আর কি?”

আর যায় কোথায়, এবার দুবোনে মিলে আক্রমণ করল —“দেখ ভাল হবে না বলছি, আমাদের দেশের নিন্দে করলে, আমরা কত কষ্ট করে বিদেশীর হাত থেকে আমাদের দেশ উদ্ধার করেছি, এমন কি আমাদের নিজের দেশের লোকের সঙ্গেও ঝগড়া করেছি। ওরা যেমন বিশ্বাসঘাতক, থাক ওরা বিদেশীদের পা'চাটা হয়ে; তুমি যেমন নিন্দুক, দেব তোমাকেও ধাক্কা মেরে বেলফাষ্টে পাঠিয়ে।”

“ওরে বাবা, না আমি সেখানে যাব না। কিন্তু সেটা কি? তোমাদের ঐ সবুজ জেলখানা বুঝি?”

খিল খিল করে হেসে উঠল ওরা দুজনে—“কি বোকা! বেলফাষ্ট গো বেলফাষ্ট—তোমার উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের রাজধানী।”

আয়ারএর রাজধানী ডাবলিন আর উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের রাজধানী বেলফাষ্ট। আমরা সবে স্বাধীনতা পাওয়া ভারতবর্ষের লোক, আমার জন্মভূমি অগ্নিযুগের কর্মক্ষেত্র বাংলাদেশ, তাই

আমার যত সহানুভূতি ঐ ডাবলিন বা আয়ারের উপর। বেলফাষ্ট ত আর সত্যিকারের আয়ার্ল্যাণ্ড নয়, ও হল বৃটিশ উপনিবেশ, তাই ওটা দেখার জন্য আমার বিশেষ আগ্রহ ছিল না। সে কথা বলতেই ময়রা আর নোরীন খুসী হয়ে উঠল। আমাদের দু'দলকেই কিনা বৃটিশ বড় যন্ত্রণা দিয়েছে, আমাদের দিয়েছে দু'শ বছর ধরে আর ওদের দিয়েছে আটশো বছর ধরে। আমাদের বৃটিশের উপর যা রাগ তার হিসাব করলে ওদের রাগের পরিমাণটাও ত আমাদের থেকে চারগুণ বেশী হবার কথা—তবে ওরা ত্রিশ বছর ধরে স্বাধীনতা পেয়েছে বলে ইংরাজদের সংগে পাশাপাশি বাস করে খানিকটা ওদের রাগ কমে বন্ধুভাব এসে গিয়েছে। একটা ব্যাপার কিন্তু ঠিক আছে এখনও। আইরিশরা বলে "ও ব্যাটা ইংরেজ, ওর আর কত বুদ্ধি হবে;" আর ইংরাজরা বলে—"ও হল আইরিশ, ওর আছেই বা কি আর বলবেই বা কি।" এমনি রেষারেষি, চোখঠারাঠারি চলে উভয় পক্ষে, আবার ভাবের বেলায় গলা-গলি, এমন কি বিয়ে পর্যন্ত আটকায় না মোটেই। আইরিশ ছেলে-মেয়েরা হরদম ইংরেজকে বিয়ে করছে, আর ইংরেজেরাও তাই। আচার-ব্যবহার চালচলনও প্রায় একই রকম উভয়ের। তবে একটা জায়গায় তফাৎ আছে, ইংরেজ আপনার চারপাশে যে গণ্ডী টেনে নিজেদের আলাদা করে রাখতে চায়, আইরিশরা তা করে না, তাই ইংরেজ থেকে আইরিশদের সংগে বাইরের লোকের বন্ধুত্ব হয় সহজে।

তাই ওদের সঙ্গে ভাব করার জন্য আবার বললাম ওদের

ভয় দেখিয়ে—"তোমরা যে কি খারাপ লোক, এতকাল ধরে তোমাদের সঙ্গে আছি, আর এখনও তোমাদের অতীত ইতিহাস আমাকে শোনাওনি কিছুই। আমি বাজি রেখে বলতে পারি, উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের লোকেরা কখনও এরকম করত না।"

ময়রা বলল—"আমরা ত সব তোমাকে বলতে পারব না—তবে কোথায় গেলে সে খবর পাবে তা বলতে পারি। চল মিউজিয়ামে যাই।"

মিউজিয়ামে

অনেক, অনেক বছর আগে সেই আর্যরা যখন প্রথম যাত্রা সুরু করেন ইউরোপের দিকে, তখন একদল লোক, যাদের আজকের ঐতিহাসিকরা বলেন 'আইবেরীয়', তারা কি করে খাবার সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে এই ছোট্ট দ্বীপটির উপকূলে ভিড়ে যায়। আবার কেউ কেউ বলেন 'আইবেরীয়েরা স্পেনদেশ থেকে এসে এখানে বাস করতে লাগল। স্পেন দেশটা বড়ই অনুর্বর, মাত্র কয়েকটা জায়গা ছাড়া ফসল বড় একটা ফলে না, তাই চারদিকে সবুজে ভরা এই দেশটা দেখে তাদের ভারী ভাল লাগল। সে কি সবুজ—যেদিকে দু'চোখ যায় খালি সবুজ মাঠের সারি, মাঝে মাঝে ঘন বন, আকাশ-ছোঁওয়া, তার সবুজ মাথায় পাখীর কাকলি, বসন্তে শাখায় শাখায় তার মুকুলের সমারোহ। শীতে যখন চারদিক বরফে ঢেকে যায়, প্রায় সারা দেশটাই ঢাকা পড়ে যায় দুগ্ধধবল শ্বেত-পাথরের গালিচার নীচে, রোদ তার থেকে ঠিকরে ফিরিয়ে নেয় তার কিরণ, তখনও চিরসবুজ কতগুলো গাছ আর ঝোপঝাড় জেগে থাকে এখানে-সেখানে। স্পেনে যেমন নেই সবুজের গালিচা

তেমনি নেই বরফের আস্তরণ, যারা এল সেখান থেকে, তাদের তাই দেশটা ভারী ভাল লেগে গেল, এখানেই তারা থাকবে, তাদের নয়নভোলানো এই সবুজে মোড়া দেশটার নাম দিল তারা পান্নাদ্বীপ।

তা না হয় হল, কিন্তু আয়ার্ল্যাণ্ড একটা দেশ ত বটে, সেখানে লোকজনও কিছু ছিল নিশ্চয়ই, তারা হল কেল্ট জাতের লোক, তারা কি বিনাবাধায় তাদের দেশটাকে ছেড়ে দেবে বিদেশীদের হাতে? লাগল লড়াই। কিন্তু তারা উর্বর দেশের 'দুধেভাতে' মানুষ, পারবে কেন তাদের সঙ্গে যারা সমুদ্র সাঁতরে এসেছে সে দেশে বাস করতে। ছোটখাট লড়াইঝগড়ার পর দু'দলে সন্ধিও হল, নবাগত আইবেরীয় আর পুরান কেল্টিক বাসিন্দারা বিয়ে-থা করে স্থির হয়ে বসে সেখানে চাষবাসে মন দিল। "যে যায় লঙ্কায়, সে হয় রাবণ" বলে যে একটা কথা আছে না, এই পান্নাদ্বীপের বেলায়ও তাই। যারাই এখানে বসবাস করতে আসছে তারাই এদের ভাষা, আচার-ব্যবহার অভ্যাস করতে করতে পান্নার রঙই নিয়ে নেয়, আর তা না হলে উপায়ই বা কি? চিরকাল যদি "আমরা তোদের দেশটা দখল করেছি", "আমরা তোদের থেকে অনেক উঁচু" এই ভাবটা রেখে চল তাহলে ত আর বন্ধুত্ব হতে পারে না, হয় শত্রুতা। আদিম পান্নাবাসীদের সঙ্গে তাই বন্ধুত্ব করার ইচ্ছে নিয়ে এই নূতন অতিথিরা এমনি মিশে গেল যে, আজকের পান্নাকুমার-কুমারীদের থেকে তাদের আর পৃথক করা যাবে না। আজ আইরিশ বলতে যাদের বোঝায় তারা

এই নতুন আইবেরীয় আর সে দেশের কেল্টিক জাতের সংমিশ্রণে তৈরী হয়েছে।

তারা না হয় বসবাসও করতে সুরু করল। তারপর? এই পান্নাবাসীদের সমাজটা কি রকম ছিল? পৃথিবীর প্রায় সব দেশেরই আদিযুগ খুঁজলে যেমন পাওয়া যায় এদেরও ছিল তেমনি! এক একটা এলাকার লোকেদের একজন করে দলপতি থাকত, যেমন থাকে এক একটা বাড়ীর একজন করে কর্তা। এই দলপতিকে বলা হত 'তানিষ্ট'; সংসার চলত এই তানিষ্টের কথামত। আর পাশাপাশি গাঁয়ের সঙ্গে ছোটখাট ঝগড়াও যে না হত তা নয়। কথায়ই বলে "জোর যার মুল্লুক তার।" যারা হেরে যেত তারা এসে দলের সংগে মিশে যেত, তানিষ্টের নাম অনুসারে গোষ্ঠীর নাম রাখা হত। এই তানিষ্ট যখন বুড়ো হয়ে পড়তেন, রাজা দশরথ যেমন রামকে যুবরাজ করতে মনস্থ করেছিলেন, তাঁরাও তেমনি একজন যুব-তানিষ্ট বেছে দিতেন; তবে রামের মত তাঁরা দশরথের কথায় যুবরাজ হতে আর কৈকেয়ীর কথায় বনে যেতে পারতেন না, কারণ সেই গোষ্ঠীর সকলে মিলে সেই তানিষ্ট বা যুব-তানিষ্টকে নির্বাচন করতেন। তাঁকে চলতেও হত সকলের পরামর্শমত।

জাতি আর ধর্ম যখন গড়ে উঠেছে তখন ধর্মও একটা ছিল নিশ্চয়ই। আর সে ধর্ম সব দেশে যেমন পান্নাদ্বীপেও তেমনি, যাকে চোখে দেখা যায় না, যাকে বোঝা যায় না, যাকে জয় করা যায় না, তাদের খুসী করার জন্য পূজা করা। সময়মত বৃষ্টি এল না, মেঘদেবতার পূজা দাও, তিনি খুসী হয়ে বৃষ্টি

পাঠিয়ে দেবেন ; পাহাড়ে-পর্বতে বিরাট বিরাট সাপ, গাছ, তারা যে কোন মুহূর্তে লোকের অনিষ্ট করতে পারে, মানুষের তারা আয়ত্তের বাইরে, পূজা করলে নিশ্চয়ই তারা খুসী হবে, আর আক্রমণ করতে আসবে না, তাদের স্তব কর। ঐ যে গোলাকার পদার্থটা সকালের দিকে আকাশে দেখা দেয় আর সন্ধ্যাবেলা নীচে নেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নেমে আসে পৃথিবীর বুকে ঘোর অন্ধকার, তাকে আরও খানিকক্ষণ ধরে রাখা যায় না কি ? এমন ব্যবস্থা কি করা যায় না যাতে সে মোটেই চলে যায় না আকাশ থেকে ? যায় নিশ্চয়ই, স্তবে আর পূজায় কে না খুসী হয়। তানিষ্ট-এর ছেলে হয়নি, গভীর রাত্রে ওকগাছের তলায় গিয়ে চন্দ্রদেবতার পূজা করলে তিনি নিশ্চয়ই খুসী হয়ে একটি ছেলে দেবেন ; তাই পুরোহিত চলল গভীর রাত্রে সেই ওকগাছের তলায়। মহাসমারোহে তাদের পূজা হল, তানিষ্ট পুত্রলাভের পর ঘটা করে পুরোহিতকে পূজা করলেন। শত্রুরা এসে আমাদের গ্রামটাকে আক্রমণ করবে খবর পাওয়া গিয়েছে, রণদেবতার পূজা করে ওদের সঙ্গে লড়াই করলে নিশ্চয়ই ওরা আমাদের হারাতে পারবে না। পুরোহিত আবার উপবাস করে গ্রামের কল্যাণ-কামনায় অদৃশ্য দেবতার কাছে পূজা দিলেন। এমনি করে মানুষ করে চলল প্রকৃতির উপাসনা, অদৃশ্য দেবতার স্তুতি। কিন্তু সকলে মিলে পূজার্চনা করলে কাজকর্ম যেমন অচল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তেমনি নানা গোলমাল, বিরোধ বেধে উঠতেই বা কতক্ষণ। তাই এর একমাত্র অধিকার রইল

পুরোহিতের। পান্নাদ্বীপের এই পুরোহিতদের নাম ছিল ড্রুইড। ড্রুইডরা বিলক্ষণ পণ্ডিত লোক হতেন, নানা বিষয়ে তাঁদের গভীর পাণ্ডিত্যের নিদর্শন পাওয়া যায়, জুলিয়াস সীজার-এর জীবনীতে এঁদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই ড্রুইডরা যে ধর্মটা অনুসরণ করতেন তাকে বলা হত ড্রুইডিসম Druidism বা ড্রুইডবাদ। পান্নাদ্বীপের আদিযুগ থেকে আরম্ভ করে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পূর্বে পর্যন্ত পান্নাকুমাররা ছিল এই ড্রুইডবাদের উপাসক। আজকের দিনে অনেক খুঁজলেও কোন চিহ্নই আর এই ড্রুইডবাদের পাওয়া যাবে না, হয়ত আচার-ব্যবহার বা পিতৃপুরুষের ধারা অনুসরণ করলে আজ কোন কোন অনুষ্ঠানের মধ্যে সে ধর্মের মিল পাওয়া যায়, কিন্তু অতি দূর গণ্ডগ্রামেও আজ আর ড্রুইডবাদের উপাসনা কেউ করে বলে শোনা যায় না।

আচ্ছা, পান্নাদ্বীপ না হয় আয়তনেও বড় ছোট, প্রকৃতিও তার বড় উর্বর, কিন্তু সব জিনিষ ত আর এক জায়গায় জন্মায় না বা যেখানে যা প্রয়োজন সব জিনিষ চট করে মেলে না নিশ্চয়ই। রাজপুত্রের বা রাজকন্যার ইচ্ছা হল ঘোড়ায় চড়বে, সেটা কোথায় পাবে, লুঠ করলেও সব সময় সে জিনিষটা পাওয়া যায় না। তাহলে তাদের নিশ্চয়ই হাটবাজার ছিল, সে হাটবাজারে জিনিষ বেচা-কেনা হত। বেশ কথা—বেচত বুঝলাম, কিন্তু কিনত কি দিয়ে? আমার ঘরে দুটো ছাগল আছে আর তোমার ঘরে দুটো গরু আছে, দুটো ছাগল বদলে কিছু আর দুটো গরু পাওয়া যায় না। সমস্যাটা কি করে

মেটানো যায় ? সৃষ্টি হল টাকার। গোল চকচকে সাদা টাকা নয়, জিনিষ টাকা। অর্থাৎ জিনিষটাকে টাকার মত ধরে নিয়ে তার বদলে জিনিষ কেনো। এক টাকায় পাঁচটা ছাগল পাওয়া যায়, গরুকে যদি টাকা ধরা হয়, তাহলে একটা গরুর বদলে পাঁচটা ছাগল দিতে হবে। আবার একটা গরুর বদলে পাঁচ সের গমও পাওয়া যেতে পারে। এ ধরণের বিক্রী করতে করতে ক্রমে লোকেরা পাঁচটা ছাগলের বদলে পাঁচসের ধান, তারপর একটা ছাগলের বদলে একসের ধানও দিতে শিখেছে, আর এমনি করেই সৃষ্টি হয়েছে আজকের দিনের টাকার। এই বদলানো ব্যাপারটাকে বলে "বিনিময়-প্রথা"। পৃথিবীর সব দেশেই টাকার চলন আরম্ভ হওয়ার আগের যুগে এই বিনিময়-প্রথার প্রচলন ছিল। যে দেশে যে জিনিষটা বেশী তাই বদলানো হত অন্য দেশের জিনিষের বদলে আর যার ক্ষেতে যে জিনিষটা বাড়তি তাই দিয়ে অন্যের ক্ষেতের বাড়তি জিনিষটা কিনে নেওয়া যেত। সব দেশের লোকেরাই আদি-যুগে সবার আগে চাষবাস করত, তাই চাষের জিনিষ, যেমন, বলদ, গরু এইসব ছিল বিনিময়-প্রথায় ভয়ানক দামী উপকরণ।

পান্নাদ্বীপের বিনিময়-প্রথার এই উপকরণটিকে বলা হত 'সেট'। এই 'সেট'-এর সোজা মানে ছিল কোন দামী জিনিষ, সেটা রত্ন হতে পারত, শস্য হতে পারত, আবার গরুও হতে পারত। জায়গা বা পাত্রভেদে এই সেট-এর চেহারাও বদলে যেত। যেমন ধর, সাধারণ লোকেরা যে জিনিষ বদলাবে,

রাজামশাই বা তানিষ্টরা ত আর তা বদলাবেন না, তাই তাঁদের সেট ছিল তিনটে বাছুর হয়ে যাবার পর সবৎসা গাভী, অর্থাৎ বাছুর-সমেত তার মা-টি। আর সাধারণ লোকের সেট ছিল একটি দুগ্ধবতী গাভী! এই গাভীর বদলে রূপা, পিতল, কাপড় সবই পাওয়া যেত। এই সবের বদলে গরুও কিনতে পারা যেত। এই রকম তিনটে সেট দিয়ে কেনা যেত একটি সুন্দরী মেয়ে, তাকে কেনা হত দাসীর কাজ করাবার জন্য, কখনও-কখনও সে আবার বাড়ীর বউয়ের মতনও থাকতে পেত, তবে তা সে বড়ই কদাচিৎ।

সাধারণতঃ কিন্তু পান্নাকুমারীদের অবস্থা ছিল মোটামুটি ভালই। অবশ্য এখনকার তুলনায় বলছি না, আগেকার দিনে অন্যান্য দেশের তুলনায়। স্বামী আর স্ত্রীর ছিল সম্পত্তিতে সমান দাবী। স্বামীর ভাগের থেকে তাদের মেয়েদের শিক্ষাদীক্ষা ইত্যাদি খরচ চালানোর নিয়ম ছিল, আর স্ত্রীর ভাগের আয় থেকে তাদের ছেলেদের খরচ চালানো হত। বিয়ে ব্যাপারটাও ছিল মোটামুটি সাধারণ আর সহজ। যদি কোন সাধারণ ঘরের বাবা-মার সখ হল আমার মেয়েকে আমি বড় ঘরে বিয়ে দেব, তাহলে সেই বড় ঘরের ছেলের জন্য কিছু সামাজিক মর্যাদা ধরে দিতে হবে। যেমন ধর— সদাগরের মেয়ের সংগে রাজার ছেলের বিয়ে হবে। আচ্ছা, কথাবার্তা ত ঠিক হল। এখন, রাজার বাৎসরিক আয় এক লক্ষ টাকা, আর সদাগরের বার্ষিক আয় পঁচাত্তর হাজার টাকা। এই যে পঁচিশ হাজার টাকার রাজা আর সদাগরের

তফাৎ, সদাগর তার এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ হাজার আষ্টেক টাকা নগদে উপহারে মিলিয়ে রাজার কাছে ধরে দেবে মেয়ের বিয়ের যৌতুক হিসাবে। তবেই সদাগর-কন্যা রাজকুমার-এর বউ হতে পারবে। আর রাজার মেয়ের সংগে সদাগরের ছেলের বিয়ে হলেও এই একই ব্যবস্থা। ছেলেমেয়ের কোন তফাৎ নেই, তফাৎ শুধু সামাজিক মর্যাদার। সেটা টাকা দিলেই পূরণ করে জাতে ওঠা যেত। আর এইসব টাকা-পয়সা ব্যাপার মিটে গিয়ে বিয়ে হয়ে গেলে পর ছেলেমেয়ে দুজনেই সম্পত্তির সমান মালিক হত। কিন্তু যদি কোন কারণে বাবা টাকা দিয়ে জামাইয়ের সমান না হতে পারত, অথচ বিয়েটা যে ভাবেই হোক হয়ে যেত, তাহলে সাধারণতঃ সম্পত্তির মালিক হতে পারত না বউ। এমনি অসমান ঘরের বউএর আরও একটা অসুবিধা ছিল, বরের যদি আরও একআধটি স্ত্রী থাকত তাহলে সমান ঘরের স্ত্রীরই দাবী বেশী, সেই হবে পাটরাণী বা প্রধান স্ত্রী। (সাধারণতঃ বিয়ে একটাই হত, তবে বড় ঘরে রাজারাজড়ার ব্যাপারে একটার বেশী বউ যে থাকত না এমন নয়) এর মধ্যে যে কোন স্ত্রীর আগে ছেলে হবে, সেই হবে সবার বড়, আর তারই সব দাবী সম্পত্তির উপর। আগে হয়ত তার কোন দাবী ছিল না, কারণ তার বাবা ঠিক ঠিক টাকা দিতে পারেন নি বা তাকে কিনে আনা হয়েছিল বাজার থেকে, তার মানমর্যাদার বালাই ছিল না, কিন্তু যে মুহূর্তে সে রাজকুমার-এর মা হল, সেই মুহূর্তে সে সকলের বড়, সে 'মা'। আর তারপর সে তার ভাগের টাকা

দিয়ে ছেলেকে পড়াশোনা করাবে, মানুষ করাবে। এবার আর ছোটঘরের মেয়ে বলে সে নিজেও ছোট হয়ে থাকবে না ; তার ছেলেমেয়েরাও লেখাপড়া শিখবে, বড় হবে, মানুষ হবে।

মেয়েরা যে ছেলেদের সংগে লেখাপড়া শিখত তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। বড়লোক, রাজা-জমিদার বা সদাগররা তাদের নিজেদের ছেলেমেয়ে নিজেরা মানুষ করত না, তাদের পাঠিয়ে দিত কোন পরিবারে, আর সে পরিবার যে সামাজিক মর্যাদায় ছাত্রছাত্রীর বাবা-মার চাইতে অনেক নীচু ঘরের হত তা বোধহয় না বললেও চলে। কখনও কখনও ছোট ছোট রাজারা বড় বড় রাজাদের ছেলেমেয়ে মানুষ করার ভার নিতেন, তার পিছনে বেশ উদ্দেশ্যও ছিল। হয়ত ছোট রাজার মেয়েকে বড় রাজার ছেলের সংগে তাহলে বিনা টাকায়ই বিয়ে দেওয়া যেতে পারবে, কিংবা নিজের ছেলের সংগে বড় রাজার মেয়েকে বিয়ে দিলে, মেয়ে কিছু সম্পত্তি ঘরে আনবে, এই রকম সব। সাধারণতঃ কতগুলো ঘর বা পরিবার বাঁধা থাকত যারা পুরুষানুক্রমে এইসব কাজ করত। তাদের বাড়ীতে এসে জড় হত রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র, সদাগরপুত্র, কোটালপুত্র, আর গুরুদেবের নিজের ছেলে-মেয়েও নিশ্চয়ই ছিল। এই সকলে মিলে এক সংগে লেখাপড়া করবে, খাবে-দাবে, থাকবে, বড় হবে। তেমনি ব্যবস্থা ছিল মেয়েদের বেলাতেও, গুরুদেব বা গুরুমার কাছে রাজকন্যা, মন্ত্রীকন্যা, কোটালকন্যা, সদাগরকন্যা আর গুরুমার নিজের পুত্রকন্যা সকলে মিলেমিশে মানুষ হতে থাকল। হিসাব করা আছে

রাজপুত্রের জন্যই বা কত খরচ পড়তে পারে, রাজকন্যার জন্যই বা কত, সে খরচ রাজকন্যারটা জোগাবেন রাজা, আর রাজপুত্রেরটা জোগাবেন রাণী, এমনি মন্ত্রীপুত্রেরটা মন্ত্রীনী, কন্যারটা মন্ত্রী, সদাগরপুত্রেরটা সদাগরনী, কন্যারটা সদাগর, কোটালকন্যারটা কোটাল আর পুত্রেরটা দিতেন কোটালনীর তহবিল থেকে। লেখাপড়া, চালচলন শিখে ছেলেমেয়েরা বাড়ী ফিরে আসত, বিয়ে-থা করে কাজকর্মে মন দিত। কিন্তু যাদের কাছে জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টা কেটেছে, তাদের তারা ভুলতে পারত না, বেশ একটা প্রীতির সম্বন্ধ গড়ে উঠত তাদের সংগে। ডাকত তাদের মা-বাবা বলেই, তাদের জন্য বড় মন কেমন করত। নিজের মা-বাবার সংগে দেখা যা কেবল জন্মের পরে কয়েকটা বছর মাত্র, বাদবাকী সময়টা ত কেটেছে ওদেরই সংগে। অনেক সময় হয়ত বিয়েটাও এই পালক বাবা-মা-ই ঠিক করে দিতেন, তাতে নিজের বাপ-মা আপত্তি করতেন না। আর পাঠশালার বন্ধুত্ব বড় হয়ে বেশ গাঢ় হয়ে উঠত। রাজপুত্র, কোটালপুত্র, মন্ত্রীপুত্র, সদাগরপুত্র এদের বন্ধুত্ব চিরস্থায়ী হত। চারদিকের সমাজটাকে প্রীতির বন্ধনে বাঁধবার জন্য এ ব্যবস্থাটা ছিল কিন্তু বেশ ভাল।

এমনি করে ভিতরের সমাজ চলল শিক্ষাদীক্ষায় এগিয়ে—আর বাইরের জগতে দলপতিরা বা রাজারা নানা আরাম আর সুখভোগ করতে করতে বা কখনও নিজেদের মধ্যে লড়াই-বিবাদ করে করে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। আর দেশ-বিদেশ থেকে আক্রমণকারীরা যখন তখন এসে লুঠতরাজ চালাতে

লাগল। সে লুঠতরাজ বেশীর ভাগই হত দক্ষিণ দিক থেকে, কারণ পান্নাদ্বীপের চারপাশে যে সমুদ্র তার মধ্যে দক্ষিণ দিকটাই অপেক্ষাকৃত ভদ্রলোক। অর্থাৎ জাহাজ বা নৌকাকে একেবারে যখন-তখন নাকানি-চুবানি খাওয়ায় না। আর তার ওপর স্পেনের উপকূল থেকে বিস্কে উপসাগর পার হতে পারলে আয়ার-এর দক্ষিণ দিকটায় চট করে নোঙর করা যায়। শুধু মাত্র যে স্পেন দেশ থেকেই এসেছিল তা নয়, ফিনিসীয়রা যারা নাকি সুবিখ্যাত কার্থেজ নগর নির্মাণ করেছিল তারা, স্কটল্যাণ্ডের অধিবাসীরা, আরও নানা জাতের সংগে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া থেকে আসতে থাকে ডেনরা আর সবার শেষে আসে নরম্যানরা অর্থাৎ বর্তমান ইংরেজদের পূর্বপুরুষরা। ইতিমধ্যে ঘটল এক কাণ্ড।

এলো খ্রীষ্টধর্ম

পান্নাদ্বীপের এক জমিদার মশাই গিয়েছিলেন বাজার করতে। সেদিন দু'-একটা দামী জিনিষও কেনারই তাঁর ইচ্ছা ছিল। কিন্তু হঠাৎ একটি ছেলেকে দেখে তাঁর চোখে লেগে যায়। ছেলেটির বয়স ছিল এই বারো কি তেরো। হলে কি হয়, সে দেখতে যেমন সুন্দর, তেমনি বুদ্ধির তার দীপ্তি চোখে-মুখে। তিনি তাকে কিনে ফেললেন। আর যেমন লোকে করে থাকে, বাড়ী নিয়ে এসে তাকে দিলেন মেষপালনের কাজ।

তার কিন্তু কাজে মন নেই। মেষের পাল নিয়ে প্যাট্রিক সমুদ্রের পারে পারে বেড়ায় আর মুক্তির উপায় খোঁজে। বার কয়েক সে ধরাও পড়ল, মারধর, ঘরে বন্ধ করে রাখা সবই হল, কিন্তু স্বভাব তার শুধরাল না। ধীরে ধীরে কেটে গেল কয়েকটা বছর। একদিন প্যাট্রিক সমুদ্রে একটা জাহাজ দেখতে পেয়ে সাদা নিশান উড়িয়ে তাকে ডাকে, খানিকটা সাঁতরে গিয়ে তাতে চড়ে প্যাট্রিক পালিয়ে গেল দেশে, স্কটল্যাণ্ডে। তারপর সে যায় রোমে। কিন্তু আয়ার্ল্যাণ্ডের

সবুজ প্রকৃতি, তার ভাষা, তাকে মুগ্ধ করেছিল, তাই সে আবার সেখানে ফিরে আসে অনেক বছর পর। এবার আর সে ক্রীতদাস প্যাট্রিক নয়, এখন সে মহামান্য খ্রীষ্টধর্ম-প্রচারক ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সেণ্ট প্যাট্রিক। এইবার তিনি মনোযোগ দিয়ে গোটা পান্নাদ্বীপটাকে ড্রুইডবাদ ছাড়িয়ে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করার জন্য উঠে-পড়ে লাগলেন; আর কতকাংশে কৃতকার্য হলেন। তিনি যখন মারা যান, সেই ৪৬৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রায় অর্ধেক আয়ার্ল্যাণ্ড খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন করেছে, ইংল্যাণ্ড খ্রীষ্টান হয়েছে তারও প্রায় একশো বছর পর।

রাজায় রাজায় লড়াই, দলপতিতে দলপতিতে মনকষাকষি, এই সময়টায় চলছিল আর বাইরের আক্রমণ ও লুঠতরাজও চলছিল, তবে কেউই বেশী ক্ষতি করতে পারেনি। তবে দিনেমাররা প্রায়ই আক্রমণ করতে আসত। আবার তাড়া খেয়ে পালিয়ে যেত। একজন তানিষ্ট-এর নাম ছিল ব্রায়াম বোরোয়ামহে। তিনি যেমন ছিলেন শক্তিশালী, তেমনি ছিল তাঁর পরাক্রম। তাঁর হাতেই ডেনরা সবচেয়ে বেশী মার খায়। ১০১১ খ্রীষ্টাব্দে তাদের তিনি এমনভাবে পরাজিত করেন যে, দেশে ফিরে গিয়ে যে খবরটা দেবে এমন লোকও আর রইল না তাদের মধ্যে। যে দু' একজন আহত বা অক্ষত ছিল, তারা পান্নাদ্বীপেরই ভদ্র শান্তশিষ্ট প্রজা হয়ে জীবনযাপন করবে বলায় রেহাই পায় আর তারা পান্নাকুমারদের সংগে মিশেঘুসে একাকার হয়ে যায়।

এইরকম করে বাইরের শত্রুদের থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে

দলপতিরা এখন মন দিলেন বিলাসব্যসনের দিকে। এই সময় লেইনষ্টার বলে একটা প্রদেশের রাজা ছিলেন ডারমট ম্যাকমারো ; এঁর যেমন ছিল অসুরের মত গায়ের জোর, তেমন ছিল উদ্ধত, আর হিংস্র স্বভাব। তাঁর আচার-ব্যবহারও ছিল ভারী বিরক্তিজনক, তাই কেউ তাঁকে দেখতে পারত না। ব্রেফনী বলে একটা ছোট দেশের রাজকুমার ছিলেন ও'রুয়ার্ক —তাঁর স্ত্রী ডারভোর্জিলা ছিলেন পরমাসুন্দরী। এই মেয়েটির রূপই হল তাঁর কাল। পদ্মিনীর জন্য যেমন চিতোর, হেলেনের জন্য যেমন ট্রয়, তেমনি ডারভোর্জিলার জন্য ব্রেফনী ত বটেই গোটা পান্নাদ্বীপটাই বিকিয়ে গেল পাশের স্ফটিক-দ্বীপের রাজার কাছে। তার মূলে অবশ্য এই দুশ্চরিত্র, মাতাল ডারমট। একদিন সুযোগ বুঝে ও'রুয়ার্ক যখন বাড়ী নেই, ডারমট লোকজন দিয়ে হরণ করে নিয়ে গেল ডারভোর্জিলাকে। বাড়ী ফিরে এসে ও'রুয়ার্ক যখন শুনলেন, বীর-বিক্রমে সৈন্যসামন্ত জড় করে তিনি চলে গেলেন যুদ্ধ করে ডারমটকে হারিয়ে দিতে। সে বিক্রমের সামনে ডারমট ভেসে গেলেন কুটোর মত, এ যেন আর এক লঙ্কাকাণ্ড। অপরাধী ডারমট পরাজিত হয়েও কিন্তু চরম প্রতিশোধ নেবার উপায় খুঁজতে লাগলেন, পালিয়ে গেলেন ইংল্যাণ্ড, শরণ নিলেন হেনরীর। তারপর ইংল্যাণ্ডের রাজা দ্বিতীয় হেনরীকে ডেকে আনলেন ও'রুয়ার্কের সঙ্গে যুদ্ধে লেইনষ্টারকে সাহায্য করার জন্য। আর এই সুযোগে ডারভোর্জিলা, ডারমটের সুরক্ষিত হারেম থেকে পালিয়ে গেল, সে আর স্বামীকে তার মুখ দেখাল

না, একেবারে রোমে চলে গিয়ে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সন্ন্যাসিনীর জীবন যাপন করতে লাগল।

সেটা ১১৬৩ সাল, ইতিমধ্যে ইংল্যাণ্ড পুরোপুরি খ্রীষ্টান ত হয়েছেই, তারও উপর আয়র্ল্যাণ্ডে নাকি খ্রীষ্টানরা ঠিকমত পূজার্চনা করছে না সে খবরও রাখছে। রোম থেকে ক্যাথলিক গীর্জার অধ্যক্ষ অনেক দিন থেকেই ইংল্যাণ্ডকে তাড়া দিচ্ছিলেন আয়ার্ল্যাণ্ডের খবরটা ঠিকমত নেবার জন্য। আর ঠিক এই সময়টায় পান্নাদ্বীপের কুপুত্র ডারমট গেলেন রাজা দ্বিতীয় হেনরীর কাছে। রাজা সুযোগ বুঝে আয়ার্ল্যাণ্ডে ছুঁচ হয়ে ঢুকলেন ফাল হয়ে বার হবেন বলে। যাহোক দু'জনে মিলে ত ব্রেফনী আক্রমণ করলেন। রাজকুমার একে ত ডারমটের সঙ্গে যুদ্ধে যে রক্তক্ষয় হয়েছিল তাই এখনও পূরণ করতে পারেন নি, তার উপর বিদেশীর শক্তি তাঁকে একেবারে বেকায়দায় পেয়ে গেল। তবুও আহত সিংহ যেমন মরিয়া হয়ে যুদ্ধ করে, ব্রেফনীরাজ তেমনি করে যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুসেনা ধ্বংস করতে করতে প্রাণ দিলেন। আয়ার্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতাসূর্য গেল অস্তাচলে, পান্নাদ্বীপের সোনার ক্ষেতে নামল বুভুক্ষু পঙ্গপালের দল।

এবার এলো ইংরেজী ভাষা

নরম্যান আক্রমণ আর দখলের পর অনেকদিন ধরে লড়াই চলল পান্নাদ্বীপের পরাজিত দলপতি আর নূতন-আসা রাজার পেয়ারের লোকদের সংগে। আমাদের দেশে যেমন সাহেব-সুবোরা রায়বাহাদুর ইত্যাদি খেতাব পেত, বেশী মাইনে পেত, ওদেরও তেমনি নরম্যান সামন্তরা বেশী সুযোগ-সুবিধা, পয়সা-কড়ি পেত। আর সেই সুযোগে পান্নাদ্বীপবাসীদের উপর বেশ সর্দারী ফলাত। তারাই বা সইতে যাবে কেন, ফলে লেগে যেত দু'দলে লড়াই। তাতেও নরম্যান ব্যারনদের সাত খুন মাপ, আর পান্নাকুমারদের বেলায় পান থেকে চুণ খসলেই শাস্তি, জেল, জরিমানা ইত্যাদি হত। এমনি করে যখন ইংরেজরা দেশে শাসনের নামে অত্যাচার চালিয়ে ভাবছে আমরা দেশটা দখল করে বেশ রাজত্ব করছি, সেই সময় ঘটল এক মজার ব্যাপার।

রাজামশাই আর তার সৈন্য-সামন্তরা ইংরেজী ভাষা ব্যবহার করতেন আর তাঁদের চেলাচামুণ্ডারাও সেই ভাষায়ই কথা বলবে এই ছিল নিয়ম। ইংরেজীটা হল রাজার ভাষা,

আর ইংরেজ হল রাজার জাত, কাজেই জাতেও তারা উঁচু, এই ছিল তাদের মনের ভাব। কিন্তু কিছুদিন পর ক্রমশঃ দেখা যেতে লাগল পান্নাকুমারদের ইংরেজী শেখানোর বদলে ইংরেজরা নিজেরাই বদলে যাচ্ছে, রাজার জাতের লোকেরা আইরিশ মেয়ে বিয়ে করছে, আইরিশ ভাষায় কথা বলছে, চাল-চলনও ধরেছে ওদের মত। রাজারা দেখলেন—মহা মুস্কিল, এ যে দেখছি 'উল্টো বুঝলি রাম' হল। ছোট জাত ঐ পান্নাবাসীদের অতটা প্রশ্রয় দিলে তারা আর ইংরেজদের মানতে চাইবে কেন? আর তারও উপর আর কিছুদিন এ রকম চললে পর পান্নাবাসীদের সঙ্গে শ্বেতদ্বীপবাসীদের আর কোন তফাৎই থাকবে না, তাঁদের ইংরেজ বলে আর কেউ চিনবে না। তাই নানারকম শাস্তির ব্যবস্থা হল। আইরিশ ভাষা ব্যবহার করলে জরিমানা, আইরিশ মেয়ে বিয়ে করলে জেল এইসব নানারকম জুজুর ভয় দেখানো সুরু হল। কিন্তু সবাই কি আর জুজুকে ভয় পায়? কিছুতেই যখন কিছু করা গেল না—তখন একেবারে মোক্ষম অস্ত্র ছাড়া হল। পান্না-কুমারী বিয়ে করলে এমন কি মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত হতে পারবে—এই বলে এক আইন পাশ হল। 'কিন্তু চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী।' যারা দেশটাকে, জাতটাকে ভালবেসে ফেলেছে তারা কি আর এসবে ডরায়? তবে একেবারে মৃত্যু-দণ্ড আর কে চায়? তাই আইরিশ ভাষা শেখা সাময়িকভাবে চাপা পড়ল, তবে ইংরেজী ভাষাও খুব ধীরে ধীরে প্রবেশ করতে লাগল।

পাঁচশো বছর ধরে চলল এই ভাষার যুদ্ধ, তারপর চার্চ এগিয়ে এল প্রতিশোধ নিতে। ১৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দের একটা নির্দেশ-নামায় দেখা যায়, 'সে বছরের ২০শে জুনের মধ্যে ইংরেজী ভাষা আয়ত্ত করতে না পারলে আইরিশ পাদরী আর প্রটেষ্ট্যান্টদের পান্নাদ্বীপ থেকে নির্বাসিত করা হবে।' এবার আর কোন ওজর আপত্তি খাটল না। যত স্বপ্ন, যত ভালবাসা সব ত দেশকেই ঘিরে তাই দেশ ছাড়ার বদলে ইংরেজীভাষা শেখার দিকেই সবাই মন দিল।

এই কঠোর নির্দেশের পিছনে আরও একটি কারণ ছিল। এর মধ্যেই পান্নাবাসীদের স্বাধীনতা আন্দোলন স্থুরু হয়ে গিয়েছে। ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজদের সঙ্গে প্রথম স্বাধীনতার জন্য সম্মুখ যুদ্ধ হয়। (আজকের বিখ্যাত নাট্যকার ও'নীল-এর পূর্বপুরুষ) ওয়েন-রো ও'নীল নির্বাচিত হলেন বিপ্লবের অবিসংবাদিত নেতা। অবশ্যই সে যুদ্ধ নিষ্ফল হল। ও'নীল যুদ্ধে নিহত হলেন। তখন ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ক্রমওয়েল। তিনি এবার এগিয়ে এলেন নিষ্ঠুরভাবে প্রতিশোধ নিতে। যাতে আর অশিক্ষিত, অসভ্য কেল্টিক জাতি মাথা তুলে না দাঁড়াতে পারে, সেজন্য লেইনষ্টার, মুনষ্টার, আলষ্টার এই তিনটি প্রদেশ থেকে যত আইরিশকে ঝেঁটিয়ে এনে একমাত্র কনটপ্রদেশে পাঠিয়ে দিলেন। কনটপ্রদেশটা রইল একেবারে একঘরে হয়ে, আর বাকী দেশটাকে ভাগে ভাগে ভাগ করে প্রতিটি ভাগেরই কর্তৃত্ব দিলেন স্কটিশ বা ইংরেজ সামন্তদের হাতে। আইরিশ মেয়ে আর স্ত্রীলোকদের পাঠিয়ে

দিলেন পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপগুলিতে, সেখানে হয় তারা দাসীবৃত্তি করবে, না হয় বেশ্যাবৃত্তি।

কিন্তু এই যে ভাষার যুদ্ধ, এরই মধ্যে বয়ে চলেছে, অন্তঃ-সলিলা ফল্গুর মত সাহিত্যের চর্চা, ওদের 'ওঘ্যাম' বর্ণমালার ক্রমোন্নতিও এই সময়েই হতে থাকে। খ্রীষ্টীয় সপ্তম, অষ্টম শতাব্দীতে এদের সাহিত্যের খোঁজ-খবর পাওয়া যায়, আর ইতিহাস নাকি পাওয়া যায় তারও আগের থেকে। পুরণো হাতে-লেখা পাণ্ডুলিপি, তার অনেকগুলো সংগ্রহ ছড়িয়ে আছে পৃথিবীর যেখানে যেখানে এর চর্চা হয়েছে—রোমে, ব্রাসেলসে, বার্লিনে আর ভিয়েনাতে। কয়েকটা কিন্তু আছে ডাবলিনের ট্রিনিটি কলেজের লাইব্রেরীতে। সে বইগুলি অবশ্য বেশীর ভাগই লেখা হয়েছিল ধর্মের আশ্রয়ে আর তাই শিল্পীরা যে সারা মনপ্রাণ উৎসর্গ করে সাধনায় সিদ্ধি পেয়েছিলেন তারই প্রমাণ দিচ্ছে আমাদের কাছে এই বই-গুলির ছবি আর সাহিত্যিক মূল্য।

আয়ার স্বাধীন হল

সন্ধ্যা তখন ছয়টা, আমি মিউজিয়মের গেটের বাইরে যেতেই দেখি নোরীন আর ময়রা অপেক্ষা করছে। নোরীন বলল, "চল বাড়ী যাই, ঘণ্টাখানেক ত লাগবে বাড়ী যেতে, ততক্ষণে খাবার সময়ও হয়ে যাবে।" এখানে একটা কথা বলে রাখা ভাল আয়ার্ল্যাণ্ডের রীতিনীতি আচার-ব্যবহার অতন্তঃ সহরের দিকে ইংল্যাণ্ডেরই মত। সকালবেলা ব্রেকফাষ্ট সেরে কাজকর্ম পড়াশোনা করতে বার হও, দুপুরবেলার খাবার আর বিকালবেলার চা-টা প্রায়ই যার যার কাজের জায়গায় খেয়ে নাও আর সন্ধ্যাবেলা বাড়ী ফেরো। খাবার নিয়মকানুনগুলি এই সব দেশের লোকেরা এত বেশী মেনে চলেছে যে, ঠিক ঠিক সময় পার হয়ে গেলে ওরা ধরেই নেয় যে, তুমি খেয়েছ কোথাও। তাই নোরীন অত সহজে বলতে পারল চল বাড়ী গিয়ে খাব। দা হলে এরা ভারী অতিথি-বৎসল জাত, গল্পে-গুজবে, খাবার-দাবার নিয়ে এমনি মশ্‌গুল করে রাখবে যে, মনেই হবে না বিদেশে আছি।

খাবার পর আগুনের ধারে গোল হয়ে বসে কফি আর

চকোলেট খেতে খেতে নোরীন বলল,—"কি গো—একেবারে চুপ করে আছ যে, কিছু বল?"

"বলছি, আগে তুমি বল দেখি উল্‌ফটোন কে ছিলেন?"

"উল্‌ফটোন, ঐ যাঁর মূর্তি আছে ট্রিনিটি কলেজের হলে?"

"হ্যাঁ, মূর্তি ত আরও অনেকের আছে, গোল্ডস্মিথের, কনগ্রীভ, সুইফট, টমাসমোর, বার্ক প্রভৃতি—তা তাঁরা সকলেই ত ছিলেন ট্রিনিটির ছাত্র, তাঁদের নামও শুনেছি, কিন্তু উল্‌ফটোনের কথা বিশেষ জানি না ত।"

জবাব দিলেন ওঁদের বাবা, "উল্‌ফটোন ছিলেন আইরিশ জাতীয় আন্দোলনের প্রথম নেতা। তিনিই প্রথম ফরাসী দেশের বিপ্লবের সময় সেখানে থেকে সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনের ধারণা নিয়ে আসেন। জন্মেছিলেন ডাবলিনে, ব্যারিষ্টারও হয়েছিলেন। কিন্তু দেশ যাদের ডাক দিয়েছে তাদের কাছে নাম, যশ, অর্থের কোন দাম নেই। তাঁরই চেষ্টায় এবং উৎসাহে উত্তর এবং দক্ষিণ আয়ার্ল্যাণ্ড সম্মিলিতভাবে আন্দোলন আরম্ভ করে।"

আমার কিন্তু মনে হয় উল্‌ফটোন যে আন্দোলনের সূত্রপাত করেন তা যেন অনেকটা আমাদের দেশের কংগ্রেসের গোড়ার দিকের আন্দোলনের মত। বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত হওয়ার কল্পনা তারা করেনি, কিন্তু দেশের লোকের আইনগত অধিকার, পার্লামেন্টে তাদের প্রবেশাধিকার, টাকা-পয়সা ব্যাপারে ইংরেজদের সঙ্গে সমানাধিকার, এই সব ছিল আন্দোলনের মূল কথা। অর্থাৎ বিপ্লবের প্রেরণা আছে,

পরাধীনতার গ্লানিও বোধ হচ্ছে অথচ পথ সম্বন্ধে কোন পরিষ্কার ধারণা নেই। ছয়শ বছর ত আর কম সময় নয়। জাতির জীবনে, সমাজে, অলসতা, পাপ অন্যায় বাসা বেঁধেছে, তবুও উল্‌ফটোনের প্রথম আহ্বানেই আশ্চর্য সাড়া পাওয়া গেল। এমন সময় ইউরোপে বেঁধে গেল ফরাসী বিপ্লব। আয়ার্ল্যাণ্ডের মানুষও আশান্বিত হয়ে উঠল, এমনি করেই তারাও ছিঁড়ে ফেলবে পরাধীনতার বন্ধন। কিন্তু শাসন যারা করে তারা সব সময় চোখ-কান খুলে রাখে, কখন কোথায় কিভাবে মানুষ তাদের দাসত্ব থেকে মুক্তি পেতে চায়, তার খোজ-খবর তাদের সারাক্ষণ রাখতে হয়। তাই পাছে এরকম কোন কিছু ঘটে বলে ইংরেজ আগেই আয়ার্ল্যাণ্ডবাসীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে রেখেছিল, ঠিক যেমন আমাদের দেশে হিন্দু-মুসলমান প্রশ্ন গড়ে তোলা হয়েছিল, তেমনি করে আয়ার্ল্যাণ্ডে খ্রীষ্টানদের দুইদল প্রটেষ্ট্যাণ্ট আর ক্যাথলিক দলে গোপন কলহের সূত্রপাত হল।

আর এই প্রশ্নের জের টেনে টেনেই শেষ পর্যন্ত উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ড তার ছয়টি কাউন্টি (জেলা) নিয়ে ইংরাজ শাসকগোষ্ঠীর ল্যাজ ধরে রইল—সে দীর্ঘ ইতিহাস আসছে পরে। আপাততঃ নূতন ফরাসী গণতন্ত্রের সংগে ইংরেজদের যুদ্ধ বাধার ছুতায়, উল্‌ফটোনের নেতৃত্বে সংগঠিত সংযুক্ত আইরিশদের বিরুদ্ধেও ইংরেজ যুদ্ধ ঘোষণা করে। পরাধীন জাতির একটা সভা-সমিতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ত আর কিছু নয়, আসলে উল্‌ফটোনকে নির্বাসন

দেওয়া হল। কারণ তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল বিপ্লবী ফ্রান্সের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ স্থাপন করে আয়ার্ল্যাণ্ডকে মুক্ত করা। শেষ পর্যন্ত ফ্রান্স থেকে সাহায্য এসে পৌঁছায় তবে বড় দেরী হয়ে গিয়েছিল, তাই সে গোলাবারুদ ব্যবহার করা দূরে থাকুক, জাহাজ থেকে তীরে নামাবার পর্যন্ত লোক পাওয়া যায়নি। উল্‌ফটোন আর একটি জাহাজে করে আয়ার-এর কূলে এসে যখন পৌঁছলেন তার আগেই দেশের বিপ্লব ইংরেজ কঠোর হস্তে দমন করেছিল, তাই আগত জাহাজটিকে হারিয়ে দিতে ইংরেজদের মোটেই বেগ পেতে হয়নি। উল্‌ফটোন বীরের মত যুদ্ধ করেও ধরা পড়লেন, ইংরেজ তাঁকে ফাঁসীর হুকুম দিল। ইংরেজ শাসকদের তিনি জানালেন বীরের মত, সৈনিকের মত তিনি মরতে চান। কিন্তু তিনি ত কেবলমাত্র বীর নন, তিনি বিপ্লবী আন্দোলনের নেতা, তাই ফাঁসীর হুকুমের আর রদ-বদল হল না, নিজের সম্মান বাঁচাবার জন্য কারাকক্ষে ক্ষুর দিয়ে গলার নালী কেটে বীরের মৃত্যু বরণ করলেন। সেটা ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দ।

এরপর আমরা অনেকগুলো বছর পেরিয়ে দেখতে পাই, ১৮৭০ সালে স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন বেশ দানা বেঁধে উঠেছে,—এই সময়কার নেতাদের মধ্যে পারনেলের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁকে বলা হয়ে থাকে 'বিপ্লবের অপরিজ্ঞাত নেতা।' তাঁর ভাব নিয়েই বিপ্লব চলেছিল, কিন্তু বেঁচে থাকতে তিনি নেতার স্থান পান নি। এখনও পর্যন্ত কিন্তু স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনই চলে আসছে, পূর্ণ স্বাধীনতা নয়।

কিন্তু তারই মধ্যে স্বায়ত্তশাসনের তৃতীয় দফা বিল নিয়ে দুই দলে আয়ার ও আয়ার্ল্যাণ্ডে গৃহযুদ্ধ প্রায় লাগে আর কি! এমন সময়— প্রথম মহাসমর বেধে উঠল, ডাবলিনে বাধল শ্রমিক বিপ্লব।

ইংরেজ কিছু কিছু শাসনক্ষমতা হস্তান্তর করতে রাজী হওয়ায় একদল লোক যাদের বলা হয় জাতীয়তাবাদী—তারা ইংরেজদের উপর বেশ খুসী হয়ে উঠল—তাদের মাথায় এটা ঢুকল না যে তারা পাচ্ছে হীরার বদলে জীরা। কিন্তু এরই মধ্যে ১৯১৬ সালে ঈষ্টার সপ্তাহে সশস্ত্র বিপ্লব বেধে গেল আয়ার্ল্যাণ্ডে, সারা পৃথিবীর লোক চমকে উঠল, এমন কি তার ঢেউ সুদূর বাংলাদেশেও এসে লাগল। ওদের অভাবিত সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে আমাদের দেশেও চলল বিপ্লবের আয়োজন।

সাতদিন ধরে ডাবলিন সহরে জি-পি-ওর উপরে 'আয়ার'-এর জাতীয় পতাকা উড়ল, কিন্তু ইংরেজের লোকবল আর অর্থবল ত ছিলই তার উপর উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের লোকেদেরও গোলাগুলী নিয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়ার ব্যাপারে ভয় ছিল, তাই কিছুদিনের মধ্যেই সকলকেই ধরা পড়তে হল, আর বোধ হয় বলে দিতে হবে না, সবাইকেই ফাঁসী দেওয়া হল। ডি-ভ্যালেরা কিন্তু গুপ্তভাবে থেকে আন্দোলন চালিয়ে গেলেন, কিছুদিন্ পর তিনিও ধরা পড়লেন, কিন্তু কৌশলে তিনি জেল থেকে পালিয়ে যেতে পেরেছিলেন বলে আন্দোলনকে আরও সাফল্যের পথে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন।

১৯১৮ সালে আয়ার্ল্যাণ্ডের পার্লামেণ্টে যে উপ-নির্বাচন

হয়, তার ফলে মাত্র ৭টা আসন বৃটিশ এবং তার চেলাদের হাতে থাকে বাদবাকী সবগুলো আসন আইরিশ গণতন্ত্র-বাদীরা দখল করে। পৃথিবীর ইতিহাসে এরকম ঘটনা আর ঘটেনি, অবশ্য ১৯৫৪ সালে আমাদের প্রতিবেশী দেশে অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্থানে সরকার পক্ষের লোকেরা মাত্র ৯টা আসন দখল করার পূর্ব পর্যন্ত আয়ার্ল্যাণ্ডের নির্বাচনই ছিল এ বিষয়ে রেকর্ড।

১৯২১ সালের সাধারণ নির্বাচনে যখন গণতন্ত্রবাদীরা ১৩০টি আসন দখল করল তখন দেশের লোক সবাই চাইল গণতন্ত্র-বাদীরা সরকার গঠন করবে আর তার ফলে বৃটিশের সঙ্গে ঝগড়াটাও আরও পাকাপাকি রূপ নিল।

কিছুদিন পর—ইংরেজ একটা সন্ধির চালাকী খেলল। তাতে করে আয়ার্ল্যাণ্ডের ২৬টি জিলাকে স্বায়ত্তশাসন দিয়ে উত্তরদিকে ছয়টি জেলা তাদের হাতে রাখল। আয়ারকে কিন্তু কতগুলি ব্যাপারে ইংল্যাণ্ডের অধীন থাকতে হবে। পার্লামেণ্টে অনেক তর্ক-বিতর্কের পর ডি-ভ্যালেরা জিতে গেলেন, আয়ার স্বায়ত্তশাসন পেল। ফলে দুই আয়ার্ল্যাণ্ডের মধ্যে বেধে গেল যুদ্ধ। ইংরেজ বলল 'এইত তোমরা মারামারি করে মরছ'। গৃহযুদ্ধের পর আবার বসল সীমানা কমিশন, কিন্তু ইংরেজের নির্ধারিত সীমানার আর রদবদল হল না, ১৯২৫ সালে পাকাপাকিভাবে দেশটা দু'ভাগ হয়ে গেল—'আয়ার' আর 'আয়ার্ল্যাণ্ড'।

১৯৩২ সালে ডি-ভ্যালেরা আবার প্রধানমন্ত্রী হলেন,

ইংরেজদের সঙ্গে সব রকম সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য তিনি উঠেপড়ে লাগলেন। ইংরেজরাও শোধ নিতে কসুর করল না, শেষ পর্যন্ত ১৯৩৮ সালে ইংল্যাণ্ডের সংগে আয়ার্ল্যাণ্ডের সবরকম বন্ধন ছিন্ন হল। কিন্তু পার্টিশনও রদ হল না, বা আয়ার্ল্যাণ্ডের পুরাপুরি স্বাধীনতাও ইংরেজ মেনে নিল না, ফলে ডি-ভ্যালেরা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ইংরেজকে সাহায্য করতে অস্বীকার করলেন। নানারকম ফন্দী-ফিকির সর্ত ইত্যাদি করে স্বাধীনতা আয়ার্ল্যাণ্ড পেল বটে, তবে তার ছয়টি জেলা তাকে ছেড়ে দিতে হল। আজও উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের শতকরা ৪৮টি লোক রোমান ক্যাথলিক আর তাই 'আয়ার'-এর সংগে মিলিত হতে চায় কিন্তু বাকী ৫২ জনের অনিচ্ছায় বৃটিশ-ঘেঁষা নীতির জন্য পেরে ওঠে না।

যেমন করে ভারতবর্ষে সৃষ্টি হল পাকিস্তান তেমনি করেই আয়ার্ল্যাণ্ডে সৃষ্টি হয়েছিল উত্তর-আয়ার্ল্যাণ্ড; ভারতবর্ষ যেমন করে যুদ্ধ, বিপ্লব, রক্তপাতের পর আপোষে স্বাধীনতা পেয়েছিল, তেমনি করে 'আয়ার'ও জেল, গুলী, ফাঁসী, মারা-মারি, বিপ্লবের পর আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে স্বাধীনতা পেয়েছিল। তাই গোড়ায় বলেছিলাম, আমাদের দুই দেশ—ছোট্ট 'আয়ার' আর বিরাট 'ভারতবর্ষ' এদের বৃটিশ ঠিক একই রকমে জ্বালিয়েছে, পালাতে বাধ্য হয়েও শেষ আশা ছাড়তে পারছে না বলে একটুখানি মাটি কামড়ে রয়েছে দু জায়গায়ই। তাই আইরিশদের সংগে আমাদের অত তাড়াতাড়ি মনের মিল হয়ে বন্ধুত্ব হয়ে যায়।

তুষারাবৃত পান্না দ্বীপ

নোরীন মহা ঝগড়া লাগিয়ে দিলে, "কেন তুমি বলেছ আমাদের দেশকে বরফ পড়লে বিচ্ছিরি দেখায়"।

বললাম "এই নাক মলছি, এই কান মলছি, আর বলব না। বলব তোমার দেশটা ভারী স্নুন্দর। যখন বরফ পড়ে চারদিকে সবুজে ছেয়ে যায়, তরতর করে ছোট নদীটি বইতে থাকে। মোটেই সাগরে ঢেউ ওঠে না, আর কি কি বলতে হবে বলে দাও তবু দোহাই তোমার অমন মুখ ভার করে থেকো না, বরফে ঢাকা ডাবলিনের মত দেখাচ্ছে যে।"

হেসে ফেলল নোরীন, "আচ্ছা দুষ্টু মেয়ে ত তুমি, আর বলব না বলে আবার বলছ ডাবলিনের মত দেখাচ্ছে, চল আজ তোমাকে কিলারণী পাহাড়ের উপর নিয়ে যাই, ভয় নেই হত্যা করব না, দেখো কি মজা হবে।"

"আগে বল তাহলে সন্ধি।"

"আচ্ছা কাল রাত পর্যন্ত সন্ধি, কাল রাতের পরও যদি তুমি আমার দেশকে মন্দ বল তখন একটা ব্যবস্থা করা যাবে।"

চললাম সবুজ বাসে উঠে। পাহাড়ী রাস্তা, এঁকে বেঁকে

উপরে উঠে গেছে; বেশ অনেকটা দূর গিয়ে থামল। আমরা পাহাড়ের সিকিটাক বাসে করেই উঠে এলাম, তারপর সুরু করলাম উপরে উঠতে। সবচেয়ে উঁচু জায়গায় কি কতগুলো বেদীর মত করা আছে। নোরীন বল্ল,—"এখানে এবার বল তোমার মনের ইচ্ছাটা কি ?"

বললাম একটু ওর মন রাখবার জন্যই "ইচ্ছাটা ত বরফ পড়ুক, তাহলে তোমাকে একবার দেখাই তোমার দেশের চেহারাটা কি।"

নোরীন হেসে ফেলল—"আমারও ত তাই ইচ্ছা, আর জান আমাদের ইচ্ছাটা পূরণ হবে কারণ আমরা যেখানে বসে আছি তার নাম হল Wishing Stone অর্থাৎ মনস্কামনা সিদ্ধ হয় এখানে চাইলে।"

"আচ্ছা ঐ দূরে কি দেখছ বল ত ?"

"আমি ত চারদিকে যতদূর চোখ যায় খালি সাগরের বুকে আকাশ আর আকাশের গায়ে নীল সাগরের ঢেউ দেখতে পাচ্ছি, আর একটু কাছে দেখছি পাহাড়ের নীচেই সবুজ গাছের নীচ দিয়ে চলে যাওয়া গোল পথ, তার এক পাশে সমুদ্রের জল আটকে রাখা দেয়াল আর এক পাশে সুন্দর সুন্দর ছোট বাড়ীগুলোর লাল টালির ছাদ, চিমনি থেকে ধোঁওয়া বার হচ্ছে। আর এ দিক দিয়ে ঘন বন, ঝরে-পড়া পাতায় হলদে হয়ে গিয়েছে তার ভূমিতল। আচ্ছা, সমুদ্রের মধ্যে ঐ যে ছোট্ট লাল ঘাঘ্‌রা পরা মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে ও কি করছে ওখানে, ডুবে যাবে না ?"

"এই বুদ্ধি তোমার ? একটা মেয়ে কখনও ঐ ঢেউয়ের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে ? সমুদ্র ওর পা ধুইয়ে দিচ্ছে দেখছ না ? ওটা ত 'লাইট হাউস'। 'লাইট হাউস' কাকে বলে জান ত ?" •

হঠাৎ মনে পড়ে গেল আর একটি বন্ধুর কথা। এই নোরীন-এরই বয়সী হবে। বোধ হয় বছর বার তার বয়স, এলস্‌বেথ্—(এলিজাবেথ্-এর জার্মাণ সংস্করণ আর কি) তার নাম। লণ্ডনের রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে পার্লামেণ্ট ভবনের সামনে দাঁড়িয়ে ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "আচ্ছা ওখানে কি হয় ?"

সে আমার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে জবাব দিয়েছিল —"ওখানে বসে আমাদের দেশের বিদ্বান লোকরা ঠিক করে তোমার মতন মেয়েরা আমাদের দেশে আসার উপযুক্ত কি না", মনের মত জবাব পেয়ে আমি সেদিনও চুপ করে গিয়েছিলাম আজও গেলাম।

তুজনে মিলে এবার নামতে লাগলাম, বনের ভিতর দিয়ে সরু পায়ে-চলা পথ ধরে চললাম। মাঝে মাঝে ন্যাড়া গাছের মাঝখানে হঠাৎ জেগে থাকা সবুজ পাইন গাছের ফাঁকে ফাঁকে লুকিয়ে পড়তে লাগলাম। তুটো বড় বড় গাছের মাঝখানে এসে হঠাৎ বলল নোরীন আবার—"এবার তোমার মনের ইচ্ছাটা বল শুনি ?" "ইচ্ছা ত হয় তোমাদের এই বনের ধারে সমুদ্রের কিনারে আকাশ যেখানে গাঁয়ের সীমা ছুঁয়েছে সেখানে একটি ছোট্ট লাল কুঁড়ে বেঁধে থাকি।" বেশ গম্ভীর-

ভাবে নোরীন বলল, "তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে, এটাও একটা ইচ্ছা পূরণের জায়গা কি না, তোমার তাহলে আমার দেশটা নিশ্চয়ই খুব ভাল লেগেছে বল—না হলে আর থাকতে চাও ?"

তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বললাম "ভাল না আরও কিছু! আমাদের দেশে অমন কত আছে দেখলেই মনে হবে ছবি আঁকি। যেও একবার আমাদের দেশে। গঙ্গার তীরে তীরে ছোট গ্রাম, সবুজ ঘাসের গালিচা বিছানো মাঠ, আর মাঝে মাঝে দুটো চারটে চরে-খাওয়া গরুর ডাক দুপুরবেলা কি মিষ্টি যে লাগে তার কাছে কোথায় তোমাদের বরফে ঢাকা, কাদা-প্যাচপেচে পাথুরে জমির রাস্তা।"

এবার নোরীন সত্যি রেগে গেল—আগে আগে চলতে লাগল। আমি দৌড়ে এসে কাঁধে হাত বুলিয়ে বললাম, "লক্ষ্মী দিদি রাগ কোরো না, আমি ত এখনও বরফে ঢাকা রাস্তা দেখিনি, আর বরফ পড়তেও দেখিনি, তাই বরফের কথা মনে হলেই শীত শীত করে, তোমাকে রাগিয়ে দিয়ে একটু শরীরটা গরম করে নিই।"

হো হো করে হেসে উঠল সে, "তুমি ত আচ্ছা নিন্দুক।"

ওকে ঠাণ্ডা করার জন্য জিজ্ঞেস করলাম "আচ্ছা বল ত বরফ যখন পড়ে তখন তোমরা ঐ পাহাড়ের ঢালু রাস্তা বেয়ে কি করে ওঠ ?"

"কেন আমরা শ্লেজ চড়ি। বাবা সুন্দর শ্লেজগাড়ী বানিয়ে দেন, কখনও আমি, কখনও দিদি, কখনও দাদা সকলে পালা করে চড়ি আর ঠেলি, ওঃ সে যে কি মজা ?"

কথা বলতে বলতে বাড়ী ফিরে এলাম, চায়ের টেবিলে বসে আলাপ হতে হতে হঠাৎ আমি বললাম, "আচ্ছা আজ কিন্তু অত শীত নেই।"

ওদের বাবা বললেন "শুধু আজ নয় আজ তুইদিন ধরেই শীত কমে গিয়েছে, বোধ হয় বরফ পড়া স্মুরু হবে।"

মিটমিট চোখে নোরীন তাকাল আমার দিকে। আমি দেখে বললাম, "নোরীন আর আমি আজ ইচ্ছা জানিয়ে এসেছি বরফ পড়ার জন্য", সবাই হো হো করে হেসে উঠল।

সন্ধ্যার আঁধার হতেই আলো জ্বেলে আগুনের পাশে গোল হয়ে বসে গল্প করছি, ময়রা, শোন্, আমি, ওদের বাবা, শোনের এক বন্ধু। সকলে মিলে তাস খেলা চলছে—এমন সময় 'নিগার' ওদের কুকুরটা বারে বারে জানালার কাছে গিয়ে ডেকে লাফাতে লাগল, মনে হল কিছু বলবে। কোথায় ছিল নোরীন দৌড়ে এল চীৎকার করতে করতে, "শীগগীর এস বরফ পড়ছে"। হাতের তাস ফেলে দিয়ে পড়ি কি মরি করে ছুটলাম, দরজাটা খুলে মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

ইতিমধ্যে বেশ কয়েক ইঞ্চি বরফ পড়ে সামনের জমিটা ধবধবে সাদা হয়ে গিয়েছে। পেঁজা তুলোর সারি যেন কেউ আকাশ থেকে ছুঁড়ে মারছে, তারা এসে এগাছ, ওগাছ এ-বাড়ীর ছাদ ও-বাড়ীর দেয়ালে আটকে সাজিয়ে তুলেছে বেঙ্গমা বেঙ্গমীর পথ বলে দেওয়া তুধ সাগরের দেশ, গাছে গাছে তার ঝুলছে মুক্তার ফল, আর পান্নার পাতা। ক্রমশঃ সেই পান্না রংও ঢাকা পড়ে গেল শুভ্র সুন্দর তুগ্ধধবল বরফের

তলায়। রাস্তায় চলতে গিয়ে জুতোর তলায় মচ্‌মচ্‌ করে উঠল জমাট তুষারের স্তূপ, তারা যেন বলে উঠল তুমি কি নিষ্ঠুর, পথে-চলা ঐ জুতো দিয়ে আমাদের মাড়িয়ে দিলে, ময়লা করে দিলে আমাদের নূতন বছরের সাজকে। চারদিকের দরজাগুলোর ভেজান দরজার আশপাশ থেকে ছিটকে আসা আলোয় রাশি রাশি মণিমাণিক যেন হঠাৎ ছাড়া পেয়ে ঝলমল করে উঠল। মনে মনে নোরীনকে জানালাম আন্তরিক প্রীতি।

আয়ার্ল্যাণ্ড

পান্নাদ্বীপ যখন ইংরেজের অধীন ছিল, তখন তার রাজধানী ছিল ডাবলিন আর দ্বিতীয় নগর ছিল বেলফাষ্ট, তাই ডাবলিনে আছে গীর্জা, লাটসাহেবের বাড়ী, পরিষদ ভবন এইসব আর তার সংগে আছে বিশ্ববিখ্যাত ট্রিনিটি কলেজ। মিউজিয়ম, চিড়িয়াখানা কিছুরই অভাব নাই এখানে। এই কলকাতারই আর এক ভাই ধর না কেন। কিন্তু সেকথা বলার উপায় আছে নাকি! ওরে বাপরে, নোরীন ত একেবারে তেড়ে উঠল, "যে-কোন বড় সহরের চেয়ে ডাবলিন অনেক সুন্দর, তোমাদের লণ্ডনের চেয়েও!"

হেসে বললাম "আমাদের লণ্ডন নয়, আমাদের কলকাতা, আমাদের দিল্লী। তবে টেম্‌স্‌পারের লণ্ডন রূপেরসে যেমন ঝলমল করে তোমাদের ডাবলিন তেমন করে না, আমাদের কলকাতা যুদ্ধের আগে করত বলে শুনেছি। তবু সে আমার দেশ, তাই তাকে আমার এত ভাল লাগে, তোমারও বোধ হয় সেজন্যই ভাল লাগে।"

"শুধু তা নয়, দেখ দেখি কেমন সুন্দর সমুদ্রপারের রাস্তা দিয়ে সবুজ মাঠের, ঝোপঝাড়ের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া ছোট নদীর পুলের উপর দিয়ে সবুজ বাস চলে যাচ্ছে দূর থেকে দূরে, গ্রাম থেকে গ্রামে। ঐ যে ওকনেল ব্রিজ দেখছ, আছে নাকি এর তুলনা পৃথিবীতে কোথাও।"

কথা বলতে বলতে এসে পড়েছিলাম অনেক দূর। বললাম—"ঐ যে নেলসন্ পিলার দেখছি, এটিকে যে লণ্ডনের নেলসন্ পিলারের মতই দেখতে!"

"সত্যি, কিন্তু তা বলে যেন ভেবো না আমরা একে দেখে লজ্জা পাই, দেখছ না এর গায়ে কেমন বুলেটের চিহ্ন, আয়ার-এর স্বাধীনতা আন্দোলনের চিহ্ন থেকে গিয়েছে এর গায়ে! তাই এই নেলসন পিলারকেও আমরা ভালবাসি।"

ইতিমধ্যে আমরা এসে পড়েছি জি, পি, ওর ভিতর। এইখানে একটি মূর্তি আছে, তার নাম কুহুলান। এই কুহুলান 'আয়ার'-এর স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম শহীদ, জাতীয় নেতা। তাঁর কথা আসছে পরে।

এখান থেকে বার হবার সময় নোরীন একটা টিকিট কিনল, বেলফাষ্টে ওর বন্ধুর কাছে চিঠি পাঠাবে, ঠাট্টা করে বলল, "দেব নাকি তোমাকেও একটা টিকিট মেরে পাঠিয়ে?"

হেসে বললাম, "ওজন করে নাও পকেটে কত পয়সা আছে, কুলাবে ত?"

আগেই বলেছি—আয়ার্ল্যাণ্ডের দুটো ভাগ, আয়ার আর আয়ার্ল্যাণ্ড। এই আয়ার্ল্যাণ্ড হল আলষ্টার প্রদেশের নয়টা

কাউন্টি বা জিলা নিয়ে। যদিও এই উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের নিজস্ব পার্লামেণ্ট আছে, শাসন-বিভাগ আছে—কিন্তু আমাদের দেশে একটা কথা বলে না—"সর্বস্ব তোমার, চাবি-কাঠিটি আমার" এই আলষ্টারও তেমনি, আসল কলকাঠি তার ইংরেজের অধীনে, ইংল্যাণ্ডের রাণীকে বলা হয়, ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ও উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের রাণী।

পান্নাদ্বীপের রাজধানী ডাবলিন, আর আলষ্টার-এর রাজধানী বেলফাষ্ট। যে আইরিশ লিনেনের আমরা এত নাম শুনি, সেটা তৈরী হয় এই বেলফাষ্ট-এই আর এজন্যই আমাদের দেশের লোকেদের সঙ্গে আইরিশদের যত মিলই থাক আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিলাতী পণ্য বর্জনের সময় আইরিশ লিনেনও আমরা বর্জন করেছিলাম। আমাদের আর আইরিশ-দের স্বাধীনতা সংগ্রামের মুল উদ্দেশ্য হল এক—ইংরেজ শাসন ও শোষণ থেকে মুক্তিলাভ। এই লিনেনের ব্যবসাটা সুরু হয়েছিল আগেই, তার উপর অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী বিপ্লবের সময় সেখান থেকে পালিয়ে আসা হিউগেনো পরিবার আরও উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি দিয়ে এই লিনেনের উন্নতি সাধন করেন। আর তখন থেকেই আইরিশ লিনেনের এক-চেটিয়া ব্যবসায় দিয়ে ইংরেজেরা প্রচুর অর্থ পেতে থাকে।

বেলফাষ্ট সহরটা ব্রিটিশ রাজত্বের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর সহর। এই সৌন্দর্য পান্নাদ্বীপের মনোরম প্রকৃতি তাকে দান করেছেন অকৃপণ হাতে। সমুদ্র থেকে বেলফাষ্টের জমি মাত্র ৬।৭ ফিট উঁচু। 'লাগান' নদীর এখানে সেখানে পুল দিয়ে

পারাপার করার ব্যবস্থা, পার্কের ছড়াছড়ি আর সে পার্কে পার্কে ফুলপাতার সমারোহ। সহরের বুক চিরে যে রাস্তাটা গিয়েছে তার নাম রয়্যাল ষ্ট্রীট, তাতে আছে পোষ্ট অফিস, ক্লাব, লাইব্রেরী, দোকানপাট, হাটবাজার। এই বেলফাষ্টকে দেখলে কে বলবে আয়ার্ল্যাণ্ড গরীব দেশ, দেশের লোকেরা দু'বেলা পেটভরে খেতে পায় না। আর স্কুল-কলেজ। আয়র্ল্যাণ্ডের সর্বত্রই প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক, কাজেই স্কুল-কলেজের অভাব বেলফাষ্টেও নেই। তবে কটা লোকে আর স্কুল-কলেজে খরচপত্র করে পড়তে পারে? আমাদের কলকাতায় ত অনেক স্কুল-কলেজ আছে, তবে কত লোকেই ত তাতে পড়তে পারে না, তেমনি আর কি?

বেলফাষ্ট আজ শিল্পপ্রধান সহর।. কলকারখানা ইত্যাদির অভাব নেই, লিনেন ছাড়াও জাহাজ তৈরী করার মস্তবড় কারখানা আছে, দড়ি তৈরীর কারখানা আছে, আর আছে হুইস্কি মদের ব্যবসায়। কিন্তু হুইস্কি বলতে মাতালরা কিন্তু স্কচ্ অর্থাৎ কিনা স্কটল্যাণ্ডে তৈরী হুইস্কিই বোঝেন। আমাদের যেমন সন্দেশ বলতে ভীমনাগের সন্দেশ আর কি। এতসব সত্ত্বেও লোকে বলে ব্রিটিশ রাজত্বের যতগুলো শিল্পকেন্দ্র আছে, তার মধ্যে বেলফাষ্ট হল সবথেকে সুন্দর সহর। হবে না? পান্নাদ্বীপের টুকরো যে বেলফাষ্ট।

অপরাজেয় কুহুলান

অনেক, অনেকদিন আগে, কোন এক গ্রামে বাস করত এক চাষা আর তার বৌ। তাদের ছিল ছোট্ট একটি কোল-জুড়ানো ছেলে। আদর করে চাষা তার নাম দিয়েছিল কুহুলান। এই কুহুলান যখন বড় হল, আর আর সব চাষার ছেলেদের মত সেও গরু-ভেড়া নিয়ে মাঠে যেতে লাগল। হাতে তার মনোরম বাঁশীটি, সুরের ঝরণা বইয়ে দিত সে হাটে মাঠে বাটে, তার চারপাশে গাভীরা, মেষের পাল সেই সুরে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত, তারা পান্নাদ্বীপের কচি ঘাসের কোমল ডগায় মুখ দিতে পর্যন্ত ভুলে যেত। আশেপাশের রাখাল ছেলেরা তার কাছে এসে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত, তার মুখের দিকে। এমন প্রাণমাতানো সুর, এত দরদ কোথা থেকে আসে ঐ ছোট্ট একটুখানি বাঁশের বাঁশীতে।

ধীরে ধীরে রাখাল ছেলেরা বড় হয়ে উঠল। তারা একসংগে খায়, একসংগে খেলা করে, একত্রে বসে তার বাঁশীর প্রাণমাতানো সুর শোনে। মাঠে মাঠে যেন প্রাণের সাড়া পড়ে গেল, দিকে দিকে আনন্দের ঝরণা বয়ে যেতে লাগল।

এমনি করে কিশোর কুহুলান একদিন বড় হয়ে উঠল। দেহের প্রতিটি কোণ তার ভরে উঠল লাবণ্যে আর প্রাচুর্যে।

কিন্তু একদিন হঠাৎ কুহুলান বাঁশী বাজান বন্ধ করল, আর ভাল লাগে না। বন্ধুরা জিজ্ঞেস করে "কি হয়েছে তোর?" বলে "ভাল লাগে না, কি হয়েছে তা ত জানি না, তাহলে ত প্রতিকারই হয়ে যেত। যেন মনে হয় কে আমাকে ডাকছে, কে আমার সাহায্য চায়, কার যেন আমাকে প্রয়োজন। অথচ কে সে জানি না, জানি শুধু যেতে হবে। এ জীবন আমার জন্য নয়, আমার জগৎ আলাদা, আমার প্রয়োজন অন্যত্র।"

তখন পান্নাদ্বীপের এখানে সেখানে সবে স্ফটিক দ্বীপের লোকেরা পা ফেলতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু তারই মধ্যে শ্বেতসামন্তরা সবুজ কৃষকদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে সুরু করেছে। তারা সুযোগ পেলেই পান্নাকুমারদের সংগে লাগিয়ে দেয় লড়াই, দেয় তাদের দু'এক ঘা লাগিয়ে। বেচারা পান্নাকুমাররা বিদেশীদের কিছু বলতে পারে না, রাজার ভয়ে; পড়ে পড়ে মার খায় আর মনে মনে গুম্‌রে মরে। কুহুলানও মাঝে মাঝে এসব দেখে আর ভাবে কি হল তাদের? এমনি করেই কি তারা এগিয়ে যাবে মরণের মুখে, এমনি করেই কি বিদেশীর অত্যাচার সহ্য করবে তারা? বাঁশীটি হাতে নিয়েও তাতে ফুঁ দিতে ভুলে যায় সে, মন তার উদাস হয়ে যায়, কি সে করবে, কতটুকু তার ক্ষমতা, আহা তার দুঃখী ভাইবোনের দুঃখ কবে সে ঘুচাতে পারবে?

হঠাৎ যেন একদিন ঘনিয়ে এল শত্রুর অন্তিম সময়।

কুহুলানেরই এক বন্ধু রাখাল, বড় গরীব সে, গোটাকতক ভেড়ামাত্র তার সম্বল, সেদিন তার নধর ভেড়া কয়টিকে কচি ঘাস খাওয়াতে এনেছিল মাঠে। একটি শ্বেত সামন্ত যাচ্ছিল সেই পথ দিয়ে গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে। তার সে অপরূপ সুরে আকৃষ্ট হয়ে রাখালের ভেড়া কটি এদিক-ওদিক পালাতে গিয়ে সামন্তের পোষাকের ঝুলের দিকে কাদা ছিটিয়ে দেয়। সেই অপরাধে শ্বেতসামন্তটি এসে রাখালের টুঁটি টিপে ধরে মারতে মারতে নিয়ে চলল রাজার কাছে। "হতভাগা চাষা, তোর এতবড় আস্পর্ধা, তুই এমন ভেড়া পুষেছিস্। তাকে শাসন করতে পারিস্ না, আমার উপর ইচ্ছে করে লেলিয়ে দিয়েছিস্? এত সাধের পোষাকটা সেদিন করিয়েছি বেটা চাষা দিলি সেটা নষ্ট করে—চল তোকে নিয়ে যাই, রাজার কাছে, তোর আস্পর্ধার ফলটা একবার দিয়ে দিই।..."

এমনি সব সুমিষ্ট সম্ভাষণের সংগে শ্বেতসামন্ত রাখালের পিঠের উপর সমানে চালিয়ে যাচ্ছে কীল-চড়-ঘুষি...আর টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে তাকে...দূর থেকে কুহুলান দেখতে পেল রাখালের মিনতিভরা করুণ চোখ দুটি, আর সামন্তের সে বীভৎস রুদ্রমূর্তি, মুষ্টিবদ্ধ হয়ে এল তার হাতদুটো আপনা হতেই, হাতে ছিল তার বাঁশীটি, ছুঁড়ে দিল সে দূরে ফেলে, ছুটে চলল রাখালকে বাঁচাতে। সেই মুহূর্তে তার মনে হল, যেন এরই জন্য সে এত দীর্ঘকাল আকুলি বিকুলি করে মরেছে, এই যেন তার সত্যকার জীবন। চেঁচিয়ে উঠল কুহুলান নেমে আসতে আসতে "তুই লাগাতে পারছিস না দু'ঘা—তোর

থেকে কি ওর গায়ে বেশী জোর। লাগা, দে কষে কয়েক ঘা, আমিও আসছি।” প্রাণপণে ছুটতে ছুটতে সে এল সেই সামন্তের কাছে, প্রবল বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর, দুইবন্ধু মিলে দিলে তার দফা একেবারে নিকেশ করে। তারপর সেখানেই তাকে ফেলে রেখে আবার চলে গেল তারা দূরে তাদের মেষের পাল রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য। এবার কুহুলান আবার তুলে নিল তার বাঁশী, ফুঁ দিতেই চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল সুরের ঝরণা, বহুদিন পরে তৃপ্তির সংগে সে বাঁশী বাজাল আবার।

যখন সে থামল, সন্ধ্যার আকাশে তখন দেখা দিয়েছে চাঁদের ম্লান জ্যোৎস্না ; যেন তাকে ডেকে বলছে “এখন এই জ্যোৎস্না এমন ম্লান দেখছ, একে ঢেকে ফেলেছে দুরন্ত রাহু, তার কবল থেকে উদ্ধার পেলেই আবার পাবে পরিপূর্ণ আলোক।” খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে যেন মিলিয়ে-যাওয়া সুরের রেশটুকু উপভোগ করে নিয়ে কুহুলান বলল—“শোন্ এরপর আমাদের আর গাঁয়ে ফিরে যাওয়া চলবে না। আয় আমরা এখানেই ঝোপেঝাড়ে পাহাড়ে জংগলে থেকে এমন কিছু করি—যাতে এই হতভাগা বিদেশীগুলো আর আমার দেশের লোকদের উপর অত্যাচার করতে না পারে।” একটু ইতস্ততঃ করে রাখাল বলল “কিন্তু আমরা কি পারব ওদের সংগে, তাহলে রাজা যে আর আমাদের আস্ত রাখবে না রে ?”

“দূর বোকা, রাজাও আমাদের কিছু করতে পারবে না রে যদি আমরা সবাই মিলে একসংগে লড়তে পারি। আর

রাজার ক্ষমতা কি এতদূর আসে ? বলে দিবি সবাইকে, যে যে আমার সংগে এই অত্যাচারের শেষ চায়, তারা যেন আমার সংগে দেখা করে। এই পাইন গাছটার তলায় আমায় পাবি এমনি সময় রোজ।” তারপর একটু থেমে আপন মনেই বলল—“এইবার আমি আমার পথ খুঁজে পেয়েছি, আর আমাকে কাজ খুঁজে মরতে হবে না। আমার সোনার দেশকে বাঁচাবার স্বপ্নই আমাকে ডাকছিল। আজ আমি পেয়েছি সে পথের সন্ধান।”

ধীরে ধীরে কুহুলানের নাম ছড়িয়ে পড়ল দিকে দিকে, দলে দলে আসতে লাগল নিগৃহীত কৃষক আর সাধারণ লোক তার শিষ্যত্ব নেবার জন্য। সে অঞ্চলে ছোটখাট অত্যাচার প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। আতঙ্কিত ব্যারণরা রাজার কাছে গিয়ে লাগাল “এক চাষার ছেলে আমাদের উপর অত্যাচার করছে মহারাজ। আমরা কোন কাজকর্মই আর ঠিকমত চালাতে পারছি না।”

রাজা ত তেলেবেগুণে জ্বলে উঠলেন—কি সামান্য এক চাষার ছেলের এতবড় আস্পর্দ্ধা! আমার দেশের লোকেদের কাজে বাধা দেয়! মন্ত্রী, তুমি আজই এর বিহিত করবে! মন্ত্রীও ত তাই চায়, চারদিকে খালি কুহুলানের জয়গান, তাদের দেখলেই লোকে ফিস্‌ফিস্‌ করে আর দেখিয়ে দেখিয়ে কি যেন বলে। এও নিশ্চয় ঐ হতভাগা চাষার ব্যাটার কারসাজি। শয়তানটাকে পেলে মন্ত্রী নখে ছেঁড়েন। এমনি তাঁর রাগ।

চারদিকে সাজ সাজ রব পড়ে গেল, কুহুলানের কাছে

খবর গেল—তার দেশের লোকেরা যদিও তারা সংখ্যায় কম—মাত্র কুহুলানের নিজের গাঁ, আর তার আশেপাশের গাঁয়ের কয়েকশ জন—সবাই এসে জড় হল তার চারপাশে, লড়াই বাধে বাধে—

একদিন রাত্রে কুহুলানের মনটা আবার কিরকম বিষণ্ণ হয়ে গেল। চারদিকের সবুজ প্রকৃতি উদার মাঠ, ফলভরা গাছের দিকে চেয়ে মনে হল, এই বুঝি তার শেষ—আর কখনও সে এই দেশের তলায় নিঃশ্বাস নেবে না, পাবে না সে তার প্রিয়-জনের সংগ। মনটা তার মায়ের জন্য কেমন হয়ে গেল। আহা কতকাল সে মাকে দেখে না। কি এক অদম্য আগ্রহ হল তার মাকে দেখার জন্য। তখনই সে রওয়ানা হয়ে পড়ল গ্রামের পথে। 'মা' বলে ডেকে যখন তাদের ছোট্ট কুটিরের দরজায় এসে দাঁড়াল, সমস্ত পল্লী তখন ঘুমে অচেতন, শুধুমাত্র সন্তানের অমংগল আশঙ্কায় মা নীরব আকাশের দিকে চেয়ে ভাবছিলেন কবে তাঁর দুঃখের অবসান হবে, কবে তিনি দেখতে পাবেন তাঁর একান্ত প্রিয় কুহুলানের মুখ। হঠাৎ 'মা' ডাকে তাঁর চমক ভাঙল, ছুটে গেলেন তিনি দরজার বাইরে, সামনেই তার একান্ত আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্নের ধন, জড়িয়ে ধরলেন তাকে বুকে। মুহূর্তখানেক চুপ করে থেকে কুহুলান বলল "মা আমায় যে এক্ষুণি চলে যেতে হবে, তোমায় একবার দেখতে এলাম মাগো। আর কবে তোমায় দেখব জানি না। আশীর্বাদ কর মা যেন দেশের গৌরব বাড়াতে পারি।" চোখের জল মুছে মা বললেন "এস বাবা"—আঁধারে মিলিয়ে গেল আবার তার

স্বপ্নে-পাওয়া মাণিক। তবে কি সবই স্বপ্ন ?—না—তাই বা কেমন করে হবে, এখনও যে তার কাঁখের গোড়ায় লেগে আছে তাঁর সন্তানের উষ্ণ পরশ, এই ত তিনি দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছেন পথের দিকে, সবই তাহলে সত্যি, সত্যিই সে চলে গিয়েছে।……

*　　*　　*　　*

পরের দিন ভোরবেলা স্থুরু হল দু'পক্ষের লড়াই। দুদিন ধরে চলল। রাজার পক্ষ ক্রমে হেরে যেতে লাগল। তারা এসেছে পরের দেশ দখল করতে। না জানে সে দেশের পথ-ঘাটের অলিগলির সন্ধান, না আছে সে দেশের লোকের সংগে তাদের প্রাণের যোগ। গেঁয়ো চাষার ব্যাটারা কোথায় যে লুকিয়ে থাকে ঝোপেঝাড়ে, আর কি তড়িৎগতিতেই না ঝাঁপিয়ে পড়ে শত্রুর উপর। দিশাহারা হয়ে ক্রমে পিছন দিকে হঠতে লাগল তারা। দুদিনের দিন সন্ধ্যার দিকে রাজার দল একেবারেই পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেল। বিজয়ী কুহুলানের বন্ধুরা এত পরিশ্রান্ত তখন যে তারা সেখানেই মাটির উপর ঘুমিয়ে পড়ল, সবাই একত্রিত হবার সময়ও পেল না ; আর কি করেই বা পাবে ? তখন পান্নাদ্বীপের বনে-জংগলে, আকাশে সাগরে নেমে এসেছে গভীর অমাবস্যার নিকষকালো আঁধার। সবাই ভাবল কাল কাক-ডাকা ভোরে সবাইকে জড় করে একত্র বসে তারা কুহুলানের বাঁশী শুনবে। এবার তারা মুক্ত, আর ত কুহুলান বলতে পারবে না—"পরের দাস যারা, তারা আর বাঁশী শোনার উপযুক্ত নয়।"

ধীরে ধীরে পূবের আকাশ ফর্সা হয়ে এল, শীতের সুরুতে তখনও আকাশের গায়ে লেগে রইল ঘন কুয়াশার আবরণ। বিজয়ী বীরের দল তাদের সাংকেতিক আওয়াজ করে জানান দিতে লাগল সবাইকে একসংগে জড় হবার জন্য। আস্তে আস্তে সবাই এল, কিন্তু কোথায় কুহুলান, কোথায় তাদের প্রিয় নেতা। আবার সবাই বার হল তার সন্ধানে, তাকে না হলে, তার বাঁশীর সুর না হলে ত উৎসব সম্পূর্ণ হবে না। তবে কি সে গ্রামে ফিরে গেল? না তাই বা কেমন করে হবে। সে ত কোনদিন উৎসবে, আনন্দে তাদের না নিয়ে কোথায়ও যায়নি। কি এক দারুণ সন্দেহ সকলের মনেই মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চাইল, কিন্তু প্রত্যেকেই চাইল সেটাকে চাপা দিয়ে রাখতে। এমনি সময়, হঠাৎ দূরে দেখা গেল এক বিশাল দেবদারু গাছের তলায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কুহুলান, দৃষ্টি তার দূরে নিবদ্ধ, সকলে একসংগে জয়ধ্বনি করে উঠল, ঐ যে তাদের প্রিয় নেতা।

কিন্তু একি, তাদের আহ্বানে সাড়া দিচ্ছে না কেন? তবে কি এ জয়ে সে খুশী হয়নি? তাই বা কি করে হবে? কালও ত সে উৎসাহ দিয়েছে, আমাদের শত্রু বিধ্বস্ত করেছে তারই হাতের তীর। সামনে এগিয়ে যাওয়া কৃষকছেলেদের মধ্যে ছিল কুহুলানের সেই রাখাল বন্ধু। সে হঠাৎ করুণসুরে আর্তনাদ করে উঠল, "বন্ধু আর নেই।" সবাই অবাক্, ঐ ত সে গাছের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তবে!

রাখাল কাছে গিয়ে বন্ধুকে স্পর্শ করতেই তার তাড়া

খেয়ে কুহুলানের কাঁধের উপর থেকে উড়ে পালাল একটা দাঁড়কাক। সেখানে বসে সে তার চোখটা খাবার চেষ্টা করছিল আর এই দাঁড়কাকটা দেখেই রাখাল বুঝতে পেরেছিল বন্ধু আর ইহজগতে নেই। তাদের দাসত্ব থেকে মুক্ত করার জন্য সে এসেছিল, কাজ শেষ করে সে চলে গিয়েছে। শেষ মুহূর্তেও পাছে শত্রুসৈন্য তার মৃতদেহ দেখলে আবার উৎসাহিত হয়ে উঠে তাই মুমূর্ষু দেহটাকে সে দাঁড় করিয়ে রেখেছে, প্রিয় জন্মভূমির দিকে চেয়ে শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছে, জানিয়েছে বন্ধুদের সে এখনও নেতৃত্ব করছে। তাদের নিরুৎসাহ হবার সময় আসেনি এখনও। ধন্য বীর! মরণেও সে প্রিয় জন্ম-ভূমিকে ভোলেনি।*
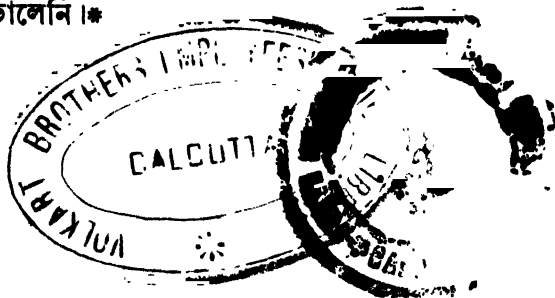
* পান্নাদ্বীপের (আয়ার্ল্যাণ্ডের) জাতীয় নেতা কুহুলান। এই অপরাজেয় বীরের মূর্তি তৈরী করে সবাইকে উৎসাহ দেবার জন্য আয়ার্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় ডাবলিনের যাদুঘরে, ডাকঘরে স্থাপন করা হয়েছিল। দাঁড়কাকটিও অমরত্ব লাভ করেছে বীরের সংগে সংগে। পান্নাবাসীদের জানিয়ে দিচ্ছে, আমিই সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেছি নেতাকে, আমিও তা বলে কম গৌরবের অধিকারী নই।